দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

ভারতের আগামী শতাব্দীর প্রস্তুতি
পৃঃ - ২৭

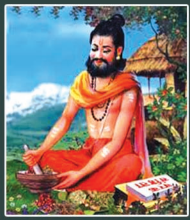

বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান ও সনাতন ধর্ম
পৃঃ - ৩১

৬৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬।। ২৬ ভাদ্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

# পূর্ব-পাকিস্তানের পথে বালুচিস্তান ?

# স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৯ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ২৬ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১২ সেপ্টেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**



দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩



**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-**

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com



স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** ▯ ৬-৯

**কাশ্মীর নিয়ে নেহরুর পাপের দায় তাঁর কন্যা ইন্দিরাও নেননি** ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

**খোলা চিঠি : মা মাটি মাদার...** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

**প্রধানমন্ত্রী মোদীর বালুচ প্যাঁচে কাত পাকিস্তান** ▯ প্রণয় রায় ▯ ১২

**পাক-নীতি প্রণয়নে ভারতের সাবালকত্ব অর্জন** ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৪

**রাজ্যের নাম পাল্টানোর চেষ্টা ইতিহাস বিচ্ছিন্নতা** ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ২০

**প্রতীকী গণপতি** ▯ ২১

**বঙ্গদেশের মুসলমান সাধক ও কবি** ▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ২২

**ভারতের আগামী শতাব্দীর প্রস্তুতি** ▯ ড. মুরলীমনোহর যোশী ▯ ২৭

**বিজেপি-র অসম বিজয়ের অভিঘাতেই পাল্টাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জী?** ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৯

**বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান ও সনাতন ধর্ম** ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১


**নিয়মিত বিভাগ**


**চিঠিপত্র : ১৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৯ সেপ্টে, '১৬

প্রকাশিত হবে
১৯ সেপ্টে, '১৬

### আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনে যেন চৌত্রিশ বছরের ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। ছাত্রবিক্ষোভ, প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ঘেরাও, অপমান, বাক্-স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা—সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই এসবের সচিত্র বিবরণ। এই নিয়েই এবার বিশেষ বিষয়—পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য। লিখেছেন ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## বালুচিস্তান কি আর একটি বাংলাদেশ হইবে?

সম্প্রতি সর্বদলীয় বৈঠকের সমাপ্তি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও বালুচিস্তানে পাকিস্তান যে নিজেদের লোকেদের উপরই নৃশংস অত্যাচার চালাইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বিষয়টি এখন এক সঙ্কটজনক সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সবরকমের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সীমান্তপারের প্ররোচনা এবং জেহাদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে প্রকাশ্যেই সমর্থন উপত্যকার কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসাত্মক কার্যে উৎসাহ জোগাইতেছে। পাক-সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে হাফিজ সঈদ, সৈয়দ সালাউদ্দিনের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতা এবং তাহাদের অনুগামীরা সীমান্ত বরাবর ও অন্যান্য স্থানে ভারত-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে, জেহাদিদের সাহায্যের জন্য তোলা আদায় করিতেছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা বিচার করিয়া দেখা দরকার। নিঃসন্দেহে ইহা ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের সূচক। মোদীর মন্তব্যের কারণে বালুচ আন্দোলনের সমর্থকরা নূতনভাবে উদ্দীপিত হইবেন। বালুচিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তান যে নিজেদের লোকের উপরই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করিয়া বোমাবর্ষণ ও নৃশংস অত্যাচার চালাইতেছে, বালুচ আন্দোলনকারীদের এই অভিযোগ আরও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। বালুচিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীর বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি এখন দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনিতে পারে। কয়েকদশক ধরিয়া পরিচালিত বালুচ-আন্দোলনের আইনি-বৈধতাকে দৃঢ় করিতে পারে।

বালুচিস্তানের ইস্যুটি উত্থাপন করিয়া ভারত যে বালুচদের এই দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে। এই অঞ্চলে নিজেদের কৌশলগত স্বার্থে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইরানও বালুচ আন্দোলনকে সমর্থনের পথে হাঁটিতে পারে। স্বাধীন বালুচিস্তান ইরানের পক্ষেও সুবিধাজনক, কেননা ওই অঞ্চলে শিয়া সম্প্রদায়ের উপর ইরানের প্রভাব বিস্তারে তাহা সহায়ক হইবে। বালুচিস্তানের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক হিসাব অনুযায়ী রাজধানী কোয়েটা (Quetta)-তে প্রায় ৫ লক্ষ শিয়া-হাজারা (Hazara) লোক বসবাস করে। তাহারা প্রায়ই পাকিস্তানি সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠীর শিকার। ২০০৮ থেকে ২০১২-র মধ্যে ৪৭৮টি ঘটনায় ৭৫৮ জন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নিহত হইয়াছেন।

পাকিস্তানে বালুচ-রা তাহাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। পাকিস্তানের আয়তনের ৪২ শতাংশ হইয়াও জাতীয় সংসদে তাহাদের জন্য সংরক্ষিত মাত্র ১৪টি আসন। সেনাবাহিনীতে বালুচ নামে রেজিমেন্ট থাকিলেও সেখানে তাহাদের উপস্থিতি মাত্র ১ শতাংশ। প্রশাসনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। এক কথায়, পঞ্জাবি নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানে বালুচরা সর্বক্ষেত্রেই নিপীড়িত, শোষিত। বালুচ আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হইতেছে অথবা তাহাদের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত যুদ্ধের জন্য আমেরিকা থেকে পাকিস্তান যে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পাইতেছে তাহা বালুচ আন্দোলন দমনে ব্যবহার করা হইতেছে। বালুচিস্তান এখন অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতার বলি। বালুচিস্তানের সম্পদ নির্মমভাবে শোষণ করা হইতেছে, পরিবেশ দূষিত করা হইতেছে, জনসংখ্যার ভারসাম্যের বদল ঘটানো হইতেছে। একটা জাতি শুধু উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতে এবং সংহতি বজায় রাখিতে পারে না। বাংলাদেশ ইহার উদাহরণ। বাংলাদেশ ও বালুচিস্তান পাকিস্তানের কাছে বলির পাঁঠা মাত্র। পাকিস্তান যদি এই বিয়োগান্তিক মোহ হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে না পারে, তবে ইহার জন্য নিশ্চিতভাবে তাহাদের মূল্য চুকাইতে হইবে। বালুচিস্তান আর একটি বাংলাদেশ হইবে।

### সুভাষিতম্

*মূর্খা যত্র ন পূজ্যতে ধান্যং যত্র সুসঞ্চিতম্।*
*দম্পত্যো কলহং নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতঃ।। (হিতোপদেশ)*

*মূর্খদের যেখানে সমাদর করা হয় না, যেখানে খাদ্যান্ন খুব ভালোভাবে রাখা হয় এবং যেখানে পতি-পত্নীর মধ্যে কলহ হয় না, সেখানে লক্ষ্মী স্বয়ং বিরাজ করেন।*

# বাংলাদেশে সিলেটে ইসকন মন্দিরে হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ঢাকার আর্টিজান বেকারিতে হামলার পর পুলিশি সক্রিয়তার কারণে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কিছু কম হয়েছিল। কিন্তু পুজোর মরশুমে আবার তা শুরু হয়ে গেল। সম্প্রতি সিলেটের ইসকন মন্দিরে হামলা ছাড়াও ৯টি মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বারংবার আশ্বাস সত্ত্বেও সেখানে হিন্দুদের পরিস্থিতির যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি তার প্রমাণ ইসকন মন্দিরের ঘটনা। বাংলাদেশ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, দিনটা ছিল শুক্রবার। ইসকন মন্দিরে রোজকার মতো পূজা-অর্চনা চলছিল। কাছেই কাজলশাহ জামে মসজিদ। আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে নমাজ পড়ায় ব্যাঘাত ঘটেছে— এই অজুহাতে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইসকন মন্দিরে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। এতে দশজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

এই হামলার পাশাপাশি অন্য একটি ঘটনায় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। শেরপুর জেলার শ্রীবরদি শহরে শ্মশানকালীর মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে তালা ভেঙে মন্দিরে ঢুকে কালী, মহাদেব, ত্রিনাথ, শীতলা, হরিশ্চন্দ্র সহ মোট ৯টি মূর্তি

ভাঙা হয়। দুর্বৃত্তরা কাঁসার বাসনপত্র-সহ প্রায় ৫০ হাজার টাকার জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

খবরে প্রকাশ, দহেরপাড় এলাকায় এক একর দশ শতাংশ জমিতে অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশানটি। গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের অন্যতম আবুল হোসেন কয়েক বছর আগে জোর করে শ্মশানের ১৫ শতাংশ জমি দখল করে মাছ চাষ শুরু করে। মন্দির কমিটি এবং শ্মশান কমিটি একাধিকবার অভিযোগ করলেও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আবুল হোসেন এলাকায় রীতিমতো প্রভাবশালী। দখল করা জমি পাহারা দেবার জন্য তিনি নৈশপ্রহরী রেখেছেন। অভিযোগ, ওই নৈশপ্রহরীর সহায়তায় মূর্তি ভাঙচুর এবং বাসনপত্র চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এইসব ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুরা আতঙ্কিত। তাঁদের প্রশ্ন এতদিন ইসলামের নামে সন্ত্রাস চলছিল। এবার কি হিন্দুদের জমি-সম্পত্তি থেকে বেদখল করার জন্য নতুন তাণ্ডব শুরু হলো? আতঙ্কে ইন্ধন জুগিয়েছে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বিজয়নগরের ব্যাঙ্ককর্তা পলাশ সাহাকে কুপিয়ে হত্যা করার প্রয়াস। স্থানীয় বাসিন্দারা সময়মতো আহত পলাশবাবুকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়ায় এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

# অসমে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া নতুন করে তৈরির প্রস্তাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নতুন করে তৈরির প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘পাকিস্তান সীমান্তে কাঁটাতারের

বেড়া যেরকম মজবুত করে বানানো হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তে কেন তা হবে না? ‘সম্প্রতি ধুবড়ি জেলায় সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনের সময় তিনি লক্ষ করেন বহু জায়গায় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কাঁটাতারে জং ধরে গেছে। ভেঙেও পড়েছে কোথাও কোথাও।

তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ‘কাঁটাতারের বেড়া যে শুধু নড়বড়ে হয়ে গেছে তাই নয়, কোথাও কোথাও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একথা স্থলসীমা ও জলসীমা— দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সীমান্তে এত ফাঁকফোকর যে সন্ত্রাসবাদীদের এ দেশে ঢুকে পড়া কোনো ব্যাপারই নয়। এসব এখনই বন্ধ করা দরকার। আর তা করতে হলে কাঁটাতারের বেড়া আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে।’ তিনি আরও বলেন এই কাজের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকেই দেওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি তিনি ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকেও জানিয়েছেন।

# ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করে চীনকে বার্তা মোদীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** ভিয়েতনাম এতকাল রাশিয়া বা চীনের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য

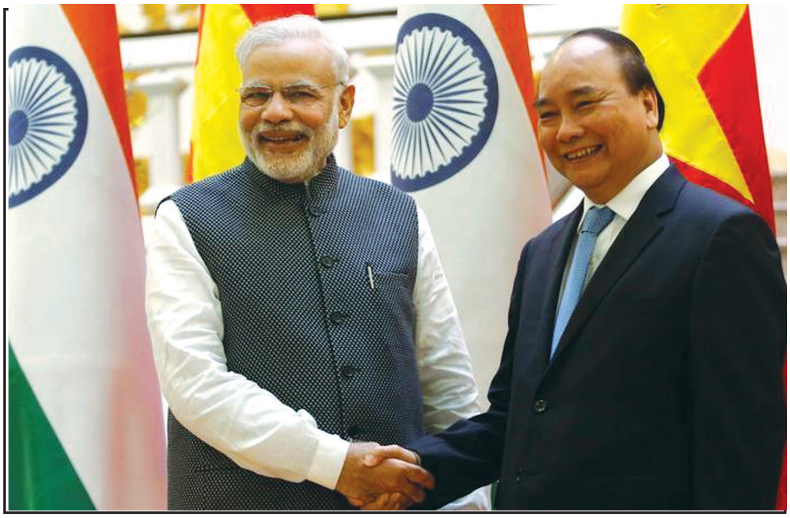

বোধ করত। কিন্তু গত কয়েক দশকে বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি বদলে গেছে। রাশিয়া প্রায় একঘরে এবং চীন পশ্চিমি মডেলে আধিপত্যবাদী। দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের দাদাগিরিতে ভিয়েতনাম উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় ভিয়েতনামের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। সম্প্রতি হ্যানয় শহরে দুই দেশের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন ভিয়েতনাম সফর করছেন।

ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী গুয়েন জুয়ান ফাক এবং মোদীর উপস্থিতিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভিয়েতনামকে ভারতের প্রাচ্যনীতির স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করে মোদী বলেছেন, 'আমাদের দুটি দেশের সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে নানান বিষয়ে মতবিনিময়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে ভারত ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের সামরিক যন্ত্রপাতি দেবে যার দাম ভিয়েতনামকে এখনই দিতে হবে না। এই সওদা হবে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি মারফত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের লারসন অ্যান্ড টুব্রো কোম্পানির সঙ্গে ভিয়েতনাম সরকারের অন্য একটি চুক্তি হয়েছে। যার ফলে ভিয়েতনাম এই কোম্পানির ১০০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত একটি পেট্রল-চালিত জাহাজ পাবে। দাম পরিশোধ করা হবে ব্যাঙ্কের ঋণপত্রের মাধ্যমে।

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি সিদ্ধান্তে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও ভিয়েতনামের পারস্পরিক বোঝাপড়া একলাফে প্রায় দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলেছে। ভারত শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম ক্ষেপণাস্ত্র ভিয়েতনামকে দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে ভিয়েতনাম এই ব্যাপারে তদ্বির করছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এর ফলে আমাদের দুটি দেশ একসঙ্গে এই অঞ্চলের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।'

মহাকাশ বিষয়ক অন্য একটি চুক্তিতে ঠিক হয়েছে ভারত দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত নজরদারি কেন্দ্র তৈরি করবে। দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে সাহায্য করবে এই কেন্দ্র। এছাড়া মোদী ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি সামরিক সফ্‌টওয়্যার পার্ক নির্মাণ করার কথাও ঘোষণা করেছেন।

## বালুচি ভাষায় আকাশবাণীর সম্প্রচার

**নিজস্ব প্রতিনিধি।। খুব শীঘ্রই আকাশবাণী থেকে বালুচি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে বলে প্রাপ্ত সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই এই ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে অনুমোদন জানিয়েছে মোদী সরকার। গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রকাশ্যেই বালুচিস্তানের পক্ষে সওয়াল করেন। উল্লেখ্য, মোদীর এই ভাষণের পর থেকে বালুচিস্তানে ইসলামাবাদের দমন-পীড়ন নীতি আরও বেড়েছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন, বালুচিস্তান ইস্যুতে পাকিস্তানকে আরও চাপে ফেলতে এবার নতুন চাল চেলেছে মোদী সরকার।**

# রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসন্ন অধিবেশনে বালুচিস্তানের মুক্তির দাবিতে ধরনা

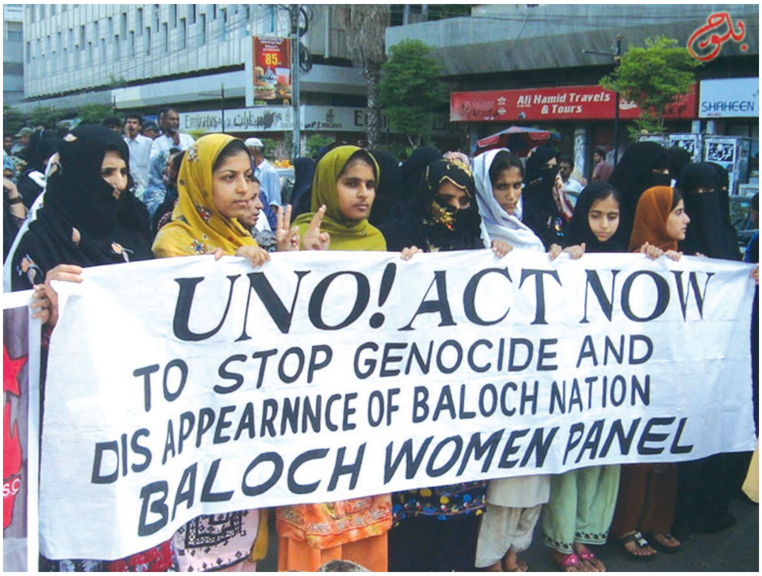


**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** পাক-সেনার অবৈধভাবে বালুচিস্তান অধিগ্রহণ এবং সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৭১ তম অধিবেশনের সময় আমেরিকায় এর প্রধান কার্যালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিল ফ্রি বালুচিস্তান মুভমেন্ট বা এফ বি এম। লন্ডন থেকে জারি করা এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান বালুচিস্তান অধিগ্রহণের পর থেকেই সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে এবং নিরীহ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করছে। বালুচ জনগণের জীবনযাত্রা পাক-সেনা কঠিনতর করে তুলেছে তাদের ওপর অত্যাচার করে, খুন করে এবং সীমাহীন সন্ত্রাসের মাধ্যমে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও দাবি করা হয়েছে যে, পাক-সেনা তাদের হেপাজতে প্রায় পাঁচ হাজার বালুচ নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা করে মৃতের স্তূপ সাজিয়েছে এবং ২০ হাজারেরও বেশি মানুষকে গুম করেছে।

এফ বি এমের বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোসোভো, পূর্ব তিমর ও দক্ষিণ সুদানে তারা ও অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলি যে ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সন্ধান পেয়েছিল ও সেখানকার নাগরিকদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সেই একই কায়দা বালুচিস্তানেও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল শক্তিশালী দেশের হাত থেকে দুর্বলদেশগুলির মানবাধিকার রক্ষা করা। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং অন্যান্য জাতির অধিকার সুরক্ষিত রাখার সনদে স্বাক্ষরও করে। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতেই ১৯৪৮-এর মার্চে তারা বালুচিস্তান আক্রমণ করে বসে এবং তারপর থেকে অত্যাচারের ট্রাডিশন সমানে চলছে। অথচ সব দেখেও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। প্রসঙ্গত, গত ৯ জুলাই স্বাধীনতাপন্থী বালুচ নেতা হারবিয়ার মারি বিষয়টি বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুক্ত বালুচিস্তান আন্দোলনের সূচনা করেন। এর প্রথম পর্বে জার্মানির বার্লিনের ডুসেলডর্ফে একটি দীর্ঘ পদযাত্রারও আয়োজন করা হয়।

*গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে থেকে 'সক্ষম'-এর উদ্যোগে কর্ণিয়া অন্ধত্বমুক্ত ভারত অভিযান উপলক্ষে সচেতনতা মিছিল। ছবি : অরিন্দম কর্মকর।*

## শিথিল হলো পাসপোর্ট সংক্রান্ত নিয়মাবলী

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** আবেদন করার এক সপ্তাহের মধ্যে যাতে হাতে পাওয়া যায় তার জন্য পাসপোর্ট সংক্রান্ত নিয়মকানুন শিথিল করল কেন্দ্র। এখন থেকে আবেদন পত্রের সঙ্গে আধার কার্ড, ইলেকট্রনিক ফোটো আইডি কার্ড (অথবা ভোটার কার্ড), প্যান কার্ড এবং আবেদনকারীর নাগরিকত্ব পারিবারিক ও চরিত্রগত তথ্য সংবলিত ঘোষণাপত্র থাকলেই পাসপোর্ট পাওয়া যাবে। পুলিশের অনুসন্ধান রিপোর্ট পরে দাখিল করলেও চলবে।

# জাকিরের এনজিও নবীকরণের মদতে চার অফিসার বরখাস্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ইসলামিক উপদেষ্টা জাকির নায়েকের এনজিও ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এফসিআরএ লাইসেন্স নবীকরণে মদত দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সংশ্লিষ্ট চার অফিসারকে বরখাস্ত করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এক ট্যুইট বার্তায় জানিয়েছেন,

জাকিরের বিরুদ্ধে তদন্ত চলা সত্ত্বেও ওই অফিসাররা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ উপেক্ষা করে তার এনজিও-র লাইসেন্স নবীকরণে মদত দিয়েছেন। তাই তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাকির নায়েকের এনজিও বিদেশ থেকে ফান্ড সংগ্রহ করে সেই অর্থে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে উস্কানি ও মৌলবাদী চিন্তাধারায় উৎসাহ দেওয়ার কাজ করে চলেছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ একটি মামলাও রজ্জু করেছে। তাদের মতে, জাকিরের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলার তদন্ত চলছে। শুধু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নয়, মুম্বাই পুলিশও তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে। জাকিরের বিরুদ্ধে মুসলমান যুবকদের বিভ্রান্ত করা, তার পিস টিভির মাধ্যমে গত কয়েক বছর ধরে দেশ-বিদেশের যুবকদের সন্ত্রাসে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

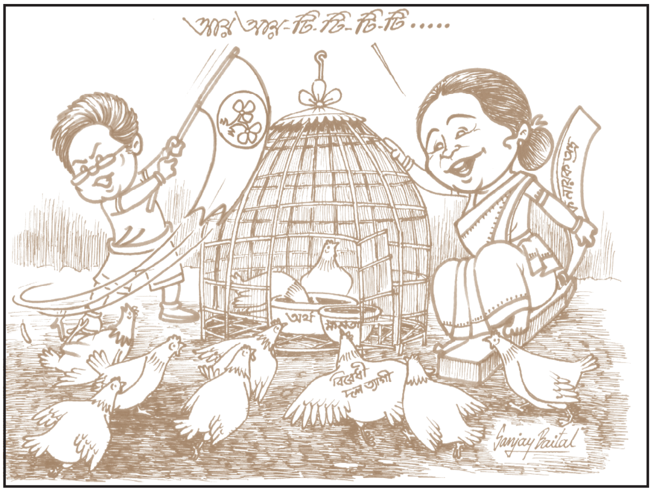


## উবাচ

"আমার মনে হয়— কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘে না গিয়ে যদি সামরিক অভিযান বিশেষ করে বায়ুসেনার সঠিক ব্যবহার করা হোত তাহলে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের থাকতো।"

**অরূপ রাহা**
ভারতের এয়ার চিফ মার্শাল

"যদি আপনি পালিয়ে বাঁচবেন বলে মনে করেন এবং এভাবে ঋণ শোধের দায় এড়িয়ে যাবেন, তবে সরকারি প্রশাসন চোখ বন্ধ করে থাকবে বলে মনে করি না।"

**অরুণ জেটলি**
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

"কলেজিয়ামে কিছু লোক জড়ো হয়ে কারা বিচারপতি হবে তা ঠিক করে ফেলে। কারও বক্তব্য রেকর্ড করা হয় না। দু'জন নাম প্রস্তাব করে অন্যদের মতামত দিতে বলে। বিচারপতি নির্বাচন কখনওই এভাবে কলেজিয়ামে নাম্বার গেমের ভিত্তিতে করা যায় না। কলেজিয়ামের সদস্যরা নির্বাচিত হন না। কারও প্রতি তাঁদের কোনো দায়বদ্ধতাও নেই।"

**জাস্টিস জে. চেলামেশ্বর**

*উচ্চতর আদালতের বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি প্রসঙ্গে।*

"রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা উচিত।"

*জি-২০ শীর্ষ বৈঠকে চীনের প্রধানমন্ত্রীকে।*

**নরেন্দ্র মোদী**
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"মাদার টেরেসার মানবতাবাদী কাজকে সম্মান জানিয়েও বলতে হয়, এটা খুবই মজার মনে হচ্ছে যে, তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রিগেড অলৌকিত্ব ও সন্তত্ব বিষয়ে কেমন অর্থবহ মৌনতা অবলম্বন করেছে।"

**বিনয় সহস্রবুদ্ধে**
রাজসভার সাংসদ

*টেরেসার সন্তত্ব প্রদান প্রসঙ্গে*

# কাশ্মীর নিয়ে নেহরুর পাপের দায় তাঁর কন্যা ইন্দিরাও নেননি

কাশ্মীর পরিস্থিতির এটি তৃতীয় কিস্তির প্রতিবেদন। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান এখন যুদ্ধের চরম সময়ের অপেক্ষায়। দুঃখের বিষয়, এমন একটা চরম সঙ্কটের প্রতিফলন কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে না। বাংলা সংবাদমাধ্যম সিঙ্গুরে মমতার জয়, বামেদের বনধ্ অথবা টেরিজার সেন্টহুডকে কেন্দ্র করে কলকাতার আন্তর্জাতিক সম্মান নিয়ে উল্লসিত। কাশ্মীর দখলে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাতে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা রাজি নয়। কাশ্মীর মানে বাঙালির পুজোর ছুটিতে সপরিবারে বেড়াতে যাওয়ার ঠিকানা। এর বেশি কাশ্মীর নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে চায় না। সেই বেড়াতে যাওয়ার ঠিকানা এখন জঙ্গি আন্দোলনে জ্বলছে। টানা প্রায় দু'মাস কাশ্মীর উপত্যকায় কার্ফু চলছে। গত ৮ জুলাই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হিজবুল কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়েছে। তার পিছনে সর্বশক্তি দিয়ে মদত দিচ্ছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই। বিপুল অর্থ ও অস্ত্র আসছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা থেকে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হুরিয়ত আলোচনার মাধ্যমে উপত্যকায় শান্তি ফেরাতে রাজি নয়। তাদের বক্তব্য, শান্তি আলোচনায় বসার আগে ভারত সরকারকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে যে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য নয়। তাছাড়াও ঘোষণা করতে হবে কাশ্মীরে গণভোট করার দায়িত্ব ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জকে দিতে প্রস্তুত। এই দুটি শর্ত মেনে শান্তি আলোচনা হলে হুরিয়ত, জে কে এলএফ— সহ অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন শান্তি প্রক্রিয়ায় শামিল হবে। এছাড়া তৃতীয় একটি শর্ত হিজবুল মুজাহিদিন রেখেছে তা হচ্ছে শান্তি প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানকেও যুক্ত করতে হবে।

**গূঢ় পুরুষের কলম**

বলাবাহুল্য, এমন সব শর্ত মেনে নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আলোচনার পথে কাশ্মীরে শান্তি ফেরাতে ভারতের ছোটবড় ২৪টি দলের একটি প্রতিনিধিদল শ্রীনগরে গিয়ে খালি হাতে ফিরেছে। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে বৈঠকের পরেও উপত্যকায় হিংসা কমার লক্ষণ নেই।

সহজ ও সোজা কথায় কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কাশ্মীরের আজাদির জন্য পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থবার যুদ্ধে নামাতে চায়। পাকিস্তান যে যুদ্ধ চাইছে তার প্রমাণ আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার লাগাতার ভারত বিরোধী প্রচার। উদ্দেশ্য, কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে বেকায়দায় ফেলা। কাশ্মীরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী রাষ্ট্রপুঞ্জে গণভোটের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হলো না কেন সে নিয়ে প্রশ্ন করছে পাকিস্তান। এই প্রশ্নের জবাব নেই আমাদের। নেহরু পরিবারের পাপের দায় নিতে কোনো দলেরই কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত নয়। নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও দায় নেননি। ফলে বিগত কয়েক দশক ধরে দিল্লীতে এক সরকার গিয়েছে, আরেক এসেছে। সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই আজও কাশ্মীর জ্বলছে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাশ্মীর রক্ষায় এখন কঠিন নীতি নিতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানো চলবে না। এই ব্যাপারে আমি গত সপ্তাহের প্রতিবেদনে ইজরায়েলের উদাহরণ দিয়েছিলাম। ইজরায়েল গত চার দশকেরও বেশি একাই মধ্য-প্রাচ্যের সমস্ত মুসলমান দেশের যুক্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করে চলেছে। তেল আভিবের শাসকরা জানেন যে মুসলমান নেতারা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। শান্তির ললিত বাণীকে তারা দুর্বলতা বলে মনে করে। সম্প্রতি পিটি আই সংবাদসংস্থাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান অরূপ রাহা বলেছেন, ১৯৪৭ সালে যখন পাক হানাদাররা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেছিল তখন সামরিক পথে না হেঁটে আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে চলে গেলাম। ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের গলার কাঁটা হয়ে রয়ে গিয়েছে। বায়ুসেনা প্রধানের বক্তব্যের সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি। ১৯৪৭ সাল এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত জয়লাভ করার পরেও দুর্বল কূটনীতির জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। বহু প্রাণের বিনিময়ে কার্গিল যুদ্ধে জেতার পরেও ভারত লাভবান হয়নি। এর কারণ ভারতের বিগত কংগ্রেস সরকারের ভ্রান্ত কূটনীতি। আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এক ইঞ্চি জমির দখল চাই না। কিন্তু ভারতের জমি সামরিক শক্তি প্রয়োগে প্রতিবেশী চীন দখল করলেও আমরা কিছু বলি না। আমাদের দুর্বল নীতির জন্যই দেশ আক্রান্ত হলে ভারতের সমর্থনে সামরিক সাহায্য নিয়ে কোনো রাষ্ট্র পাশে দাঁড়ায় না। মনে রাখতে হবে, দুর্বলকে সহানুভূতি জানানো যায়। শ্রদ্ধা করা যায় না। ■

# মা মাটি মাদার...

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

পুজো সমাগত তার আগে আর এক পুজো সদ্য শেষ হলো। নাকি শুরু হলো!

সন্ত হলেন মাদার টেরেসা। আপ্লুত তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাপুজোর সময়ে নতুন এই প্রাপ্তি নিয়ে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে 'মাদার পুজো' শুরু হতেই পারে। ব্লকে ব্লকে মাদার মেলা।

এতদিন একটা প্রবাদ খুব পরিচিত ছিল। রোম পুড়ছে, নিরো বেহালা বাজাচ্ছেন। এবার সেই সঙ্গে যুক্ত হবে— বাংলা পুড়ছে, মুখ্যমন্ত্রী রোমের রাস্তায় নগরকীর্তন করছেন। মাদারকে খেতাব প্রদান অনুষ্ঠানের আবহেই একটি ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ভ্যাটিকান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে রোমের হোটেল থেকে হেঁটে ভ্যাটিকানে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লোকসভায় তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ বেশ কয়েকজন। হাঁটতে হাঁটতেই তাঁরা সমবেতভাবে গেয়েছেন মমতার প্রিয় গান— 'মঙ্গলদীপ জ্বেলে' ('প্রতিদান' ছবির) এবং দু'টি রবীন্দ্র সঙ্গীত— 'আগুনের পরশমণি' ও 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে'। এক সময়ে গানের সঙ্গীদের কারও কারও গলা না মেলায় মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েকবার বলতে শোনা যায়, ''প্লিজ, মেনটেন দ্য স্কেল''। ওই অনুষ্ঠানে আগাগোড়াই মিশনারিজ অব চ্যারিটিজের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার প্রেমার পাশে ছিলেন মমতা। অনুষ্ঠান সম্পর্কে মমতার প্রতিক্রিয়া, ''এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সিস্টার প্রেমা আমাদের ভ্যাটিকানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেজন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।'' সেইসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি মাদারকে চিনতাম। তিনিও আমাকে চিনতেন। এখানে না এলে মিস করতাম। বাংলা সত্যিই বিশ্ববাংলায় পরিণত হয়েছে। এখানে বাংলা ও কলকাতার নাম একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে।''

আহা, ভ্যাটিকানে বাংলা ও কলকাতার নাম উচ্চারিত হয়েছে। বাংলা ধন্য হয়ে গেল। সব সঙ্কট মিটে গেল। সিঙ্গুরের জমি আবার তিনফসলি হয়ে গেল। শুধু মুখ্যমন্ত্রীই বা কেন গোটা দেশই মাদার-আদিখ্যেতায় শামিল। ডাক টিকিট প্রকাশ থেকে মাদারের নামে এটা-সেটা কিছুই বাকি রইল না। বাকি শুধু একটাই— এবার মাদারের নামে একটি সরকারি 'ধর্মান্তরকরণ কেন্দ্র' চালু হোক।

সবাই কী করে যে ভুলে গেলেন! বছরের পর বছর মাদার টেরেসা এই একটি কাজই করে গিয়েছেন। সেই কারণেই তাঁর ভারতে আসা। সেবা নামক অস্ত্র দিয়ে দলে দলে হিন্দুকে খ্রিস্টান করাই তাঁর কাজ ছিল। একই সঙ্গে এক 'যিশু মহিমা' তৈরি করা দরকার ছিল। সেটা তিনি পেরেছেন। তাই তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দিতে হয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে সন্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু যাঁরা তাঁকে নিয়ে নাচছেন তাঁরা কখনও কি মাদারের সংগঠনের ভিতরে ঢুকে দেখে এসেছেন! কখনও ভেবেছেন মাদারের বিরুদ্ধে শিশু বিক্রির যে অভিযোগ তা একবার সরেজমিনে দেখে আসা উচিত। একটা সামান্য তদন্ত অন্তত করা উচিত। বিভিন্ন সময়ে নানা পথে অর্থ গ্রহণ নিয়ে যে ভয়ানক সব প্রশ্ন উঠেছে তা কি কেউ খতিয়ে দেখেছেন? মিশনারির এই কাজ করতেই তিনি ভারতে এসেছিলেন। যাকেই অসহায়, দুর্বল, রুগ্ন দেখেছেন, তাঁকেই সেবা করার সুযোগে ধর্মান্তরিত করাই ছিল তাঁর মিশন।

অনেকের অভিযোগ গরিবকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন নিজের স্বার্থে। কলকাতার দারিদ্র্য দূর করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর কখনও ছিল না। কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেছেন আর নিজের নামে মিশনারি ছাড়া আর কিছু বানাননি। কলকাতায় একটা হাসপাতালও নেই মাদারের গড়া।

তাঁর বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ ছিল তিনি, গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের বিদেশে দত্তক দিতেন টাকার বিনিময়ে। তাঁর গড়া মিশনারিজ এখনও সুনামের সঙ্গেই নাকি সেই কাজ করে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব-বাংলা বানাতে চাইছেন। বিশ্বের কাছে বাংলা তথা কলকাতাকে এক সুন্দর গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। সাধু উদ্যোগ। কিন্তু মাদার টেরেসা চিরটাকাল বিশ্বের কাছে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কলকাতা এক গরিবের শহর। গোটা শহর কুষ্ঠরোগীতে ভর্তি। তিনি না কাজ করলে এই শহর টিকে থাকতেই পারত না। তাই তিনি সেন্ট হলেন। কিন্তু সেই 'সেন্ট' দিয়ে এই শহরের যে দুর্নাম হয়েছে তার দুর্গন্ধ ঘুচবে কি?

আর চারিদিকে 'সন্ত মা' (সন্তোষী মা পড়বেন না) পুজোর হিড়িকের মধ্যে এই সব প্রশ্ন জানি অনেক ভক্তকে আঘাত করবে। কিন্তু আমি সত্যিই শুধু প্রশ্ন তুললাম মাননীয় পাঠক-পাঠিকা। আমি কোনো অভিযোগ করিনি। আমি পুরনো অভিযোগ তুলে ধরেছি। আমার প্রশ্ন শুধু একটাই— আজ পর্যন্ত এই অভিযোগগুলি কেন গুরুত্ব পায়নি? কেন বিন্দুমাত্র তদন্তের কথা ওঠেনি?

**—সুন্দর মৌলিক**

উত্তর সম্পাদকীয়

# প্রধানমন্ত্রী মোদীর বালুচ প্যাঁচে কাত পাকিস্তান

**প্রণয় রায়**

রাখি পাঠিয়ে এক বোন নিজ মাতৃভূমি রক্ষার আবেদন জানাচ্ছে। না কোনো পৌরাণিক কাহিনি বা মধ্যযুগের কোনো রাজ সামন্তের কথাও নয় কিংবা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বানানো কোনো ছবির অংশও নয় এই আবেদন। এবছর রাখিবন্ধনে পাক অধিকৃত বালুচিস্তানের এক ছাত্রনেত্রী করিমা বালোচ এভাবেই রাখি পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছে। বালুচ নারী ইজ্জত রক্ষার ডাক দিয়েছে। করিমা বালোচ হিন্দি ও গুজরাটি ভাষায় তার কাতর আবেদনে জানিয়েছে— কীভাবে পাকিস্তানি সেনা সেখানে বালুচ মহিলাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। বালুচ যুবকদের কীভাবে পাকিস্তানি সেনা, আই এস আই, পুলিশ অপহরণ করে হত্যা করছে। বালুচ বুদ্ধিজীবীদের কীভাবে গুপ্ত হত্যা করে শেষ করে দেওয়া চলছে। তার কাতর আবেদন ‘আমাকে কুকুর বলো কিন্তু পাকিস্তানি বোলো না।’

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে বালুচিস্তানের উল্লেখ করাতেই সারাদিন পাকিস্তান জপ করার মতো আওড়াতে লাগল— এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। চীন তার সরকারি পত্রিকায় লিখল--- ‘পাক-অধিকৃত কাশ্মীর’ যাকে তারা এতদিন বলত পাকিস্তানি কাশ্মীর। কেন? পাকিস্তান হঠাৎ এত কুঁকড়ে গেল কেন? চীনের এই ভোল বদল কেন? বুঝতে হলে বালুচিস্তান-সমস্যাটা বুঝতে হবে।

বালুচিস্তান বলতেই অন্যতম শক্তিপীঠ মরুতীর্থ হিঙ্গলরাজ-এর কথা সবচেয়ে আগে স্মরণে আসবে। পাকিস্তানের একেবারে দক্ষিণে ইরান ও আফগানিস্তান ঘেঁষা এই দেশ। ১৬৬৬ সালে প্রথমবার বিভিন্ন বালুচ গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে বালুচিস্তানের গঠন করে। ইংরেজ সরকার ১৮৩৯ সালের নভেম্বর মাসে বালুচিস্তানের দখল নেয়। দেওয়ান বুচা মল ছিলেন অন্যতম হিন্দু সর্দার। তিনি ইংরেজদের হাত থেকে কালাত রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেন। কালাত ছিল বালুচিস্তানের রাজধানী। ইংরেজ অধিকারের পর এদের নাম হয় বৃটিশ বালুচিস্তান। ১৮৭১ সালে বৃটিশ ও আফগান, ইরানের মধ্যে চুক্তি করে গোল্ডাস্‌সিভ রেখা দ্বারা বালুচিস্তানের পশ্চিম সীমান্ত আঁকা হয়।

*স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী। বালুচ ছাত্রনেত্রী করিমা বালোচ।*

বৃটিশরা ১৮৯৩ সালে ডুরান্ড রেখা টেনে আফগান সীমান্তকে নির্দিষ্ট করার সময় বালুচিস্তানের উত্তর অংশ আফগানিস্তানকে দিয়ে দেয়। আবার কিছু পাখতুন/পাস্তুন গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা আফগানিস্তানের অংশ হিসেবে যুক্ত হয় বৃটিশ বালুচিস্তানের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং বৃটিশরা ৩ জুলাই এক প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত এবং পাকিস্তানকে স্বাধীন করার বিষয় চূড়ান্ত করে এবং দিন ঠিক হয় ১৪ ও ১৫ আগস্ট। ঠিক তার আগে ১১ আগস্ট ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সরকার বালুচিস্তানকে স্বাধীন করে দেয়। জিন্নার সাধের পাকিস্তানে গঠনের আগেই ভাঙন শুরু হয়। কিন্তু তখন জিন্না ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দর কষাকষিতে মত্ত ছিল, তাই তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতারা বালুচিস্তান নিয়ে কোনো রা কাড়েনি। কিন্তু বৃটিশ সেনার বালুচ রেজিমেন্ট যেহেতু পাকিস্তান পেয়েছিল তাই সেই বালুচ রেজিমেন্টকে লেলিয়ে দেওয়া হলো— পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু শিখদের উপর। আসলে পাকিস্তানি নেতৃত্ব এই ভাবেই জেহাদের জিগির তুলে হয়তো সেদিন বালুচ জাতিসত্তাকে ইসলামি জাতিসত্তার মধ্যে সমাহিত করে দিতে চেয়েছিল। মানিকচন্দ্র বাজপেয়ীর লেখা ‘জ্যোতি জলা নিজ প্রাণ কি’ গ্রন্থে স্বাধীনতার প্রাক্কালে বালুচবাহিনীর অত্যাচারে কথা লেখা আছে। স্বাধীন বালুচিস্তানের প্রথম সংসদের অধিবেশন চলে ১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭। সেখানেই স্বাধীন বালুচিস্তানের প্রশাসন-বিদেশ নীতি নিয়ে আলোচনা ও ঘোষণা হয়। ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে আবার বালুচিস্তানের সংসদ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আইনসভায় আলোচনায় বসে। কিন্তু হঠাৎ ২৭ মার্চ ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি সেনা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বালুচিস্তানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দখল নেয়। শুরু হয় বালুচ গণহত্যা। বলা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যার পর সবচেয়ে বড় গণহত্যা চলেছে বালুচিস্তানে।

পাকিস্তানের মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে বালুচিস্তান। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের জনসংখ্যা কিন্তু পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫ ভাগেরও কম। বর্তমানে পাকিস্তানি আর্মিতে বালোচদের সংখ্যা ১ শতাংশও নয়।

পাকিস্তানের সরকার এবং সেনা মূলত পঞ্জাবি মুসলমান কেন্দ্রিক। অন্য জনগোষ্ঠী যেমন সিন্ধি, বালুচ, ভারত থেকে দেশভাগের সময় যাওয়া মুসলমান যাদের মোহাজিব বলা হয়, পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানি বাঙালি এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। বাঙালিরা ১৯৭১ সালেই স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। আর অন্য গোষ্ঠীগুলিও অত্যন্ত ছোট গোষ্ঠী হওয়ার ফলে পাকিস্তানের কাছে এক মাত্র চ্যালেঞ্জ বালুচিস্তান। যদিও সিন্ধু প্রদেশ অনেক আগেই স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিয়েছে। পাকিস্তানের বালুচিস্তান দখলের বিরুদ্ধে যুবরাজ আবদুল করিমের নেতৃত্বে বিদ্রোহের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯৪৮ সালে। নবাব নওরজ খানের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় বিদ্রোহ হয়। এই সকল সশস্ত্র বিদ্রোহের

ভয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে গঠিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিশাল বালুচ রেজিমেন্টের এক বড় অংশ পঞ্জাব রেজিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কিছু অংশ মিশিয়ে দেওয়া হয় বাহালপুর রেজিমেন্টের সঙ্গে। ১৯৭০ সালে নবাব খয়ের বক্স মারির নেতৃত্ব আবার বিদ্রোহ হয়। এবার বহুকষ্টে পাকিস্তানি বাহিনী সামাল দেয়। ১৯৮৮ সালে বালুচ রেজিমেন্টের সামান্য যা অবশিষ্ট ছিল, নতুন সিন্ধু রেজিমেন্ট গঠন করে তাও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ফলে বালুচিস্তানের সেনা বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের আশা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কিন্তু বালুচ স্বাধীনতাকামীরা থেমে থাকেনি। ১৯৯৬ সালে বালুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) গঠন করে আবার গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে যা এখনও চলছে। অন্যদিকে বালুচিস্তানের কিছু রাজনৈতিক নেতা যারা পাকিস্তানি রাজনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে ছিল, পাকিস্তানি সেনা তাদেরও হত্যা শুরু করে। নবাব আকবর বুগতি যিনি শুধু বালুচিস্তান নয়, পাকিস্তানের সুপরিচিত নেতা তাকে সেনারা ২০০৬ সালে হত্যা করে। বালোচ জাতীয় আন্দোলন (Baloch National Movement) দলের নেতা গুলাম মহম্মদ বালোচ ও লালা মুনির এবং বালোচ রিপাবলিক পার্টির নেতা শের মহম্মদ বালোচকে ২০০৯ সালে প্রথমে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই তাদের গুপ্তহত্যা করে। বালোচ জাতীয় আন্দোলনের নেতা ড. মামন বালোচকেও হত্যা করে সেনাবাহিনী। বালুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি)-র জাতীয় সম্পাদক হাবিব জালিব বালোচকে গুপ্তহত্যা করা হয় জুলাই ২০১০ সালে। বিগত ৭০ বছর ধরে বালুচিস্তানের বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রত্যেকদিন হয় গুপ্তহত্যা নয় পাকসেনা বা আই এস আই-এর গুপ্ত ঘাতকরা অপহরণ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। পাকিস্তানের সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০ হাজার বালোচ যুবকের কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। সবচেয়ে করুণ অবস্থা মহিলা ও শিশুদের। পাকিস্তানি সেনার সার্চ অভিযানের দরুন শ্লীলতাহানি বা ধর্ষণ এবং কিশোরী-যুবতী অপহৃত নিয়মিত ঘটনা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানি সরকারি সন্ত্রাসের দরুন কম করে ৩৩ হাজার বালুচ শিশু বর্তমানে আই ডি পি অর্থাৎ Internally Displaced Persons। আরও উল্লেখ্য, বালুচিস্তানে শুধুমাত্র খাদ্যাভাবে প্রতিবছর ৮ থেকে ১০ হাজার শিশু মারা যায়। শাসন ক্ষমতা থাকা কালে জেনারেল মুশারফ বালুচিস্তানে 'enforced disappearances' নীতি শুরু করে। সেনাবাহিনী, আই এস আই ও তার গুপ্ত বাহিনী হত্যা করে কয়েক হাজার বালুচকে। ২০০৪ সালে পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি সারদারি 'kill and Dump' নীতি দ্বারা বালুচিস্তানকে বালুচ শূন্য করতে উঠেপড়ে লাগে।

ইতিমধ্যে বালুচিস্তানের স্বাধীনতার পথে আর একটি প্রতিপক্ষের জন্ম হয় যার নাম চীন। কারণ চীনা-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) যার মূল কেন্দ্র বালুচিস্তানের গোয়াদর, কিছ্, পানজুগুর ও আওরান। শুরু হয় বালুচিস্তানে বালুচদের তাড়ানোর প্রক্রিয়া। গড়ে উঠতে থাকে চীনা ও পাঞ্জাবি মুসলমানদের একের পর এক কলোনি। ২০০০ সালে শুরুর দিকে শুধু ডেরা ভুগটি-কোহলু থেকে ৩ লক্ষ মানুষ পালিয়ে যায়। ২ লক্ষ মানুষ গোয়াদর অঞ্চল ছাড়তে বাধ্য হয়। বালুচ নেতাদের অভিযোগ আনকারা বাঁধকে শুকিয়ে ফেলা হয় শুধু গোয়াদর অঞ্চলে কৃত্রিম জলসঙ্কট তৈরি করার জন্য। সরকারি জলপ্রকল্প থেকে শুধুমাত্র নবগঠিত চীনা ও পঞ্জাবি মুসলমান কলোনিগুলিতে জল সরবরাহ করা হয়।

বালুচ স্বাধীনতার পথে একটি বড় বাধা বালুচিস্তান অঞ্চলে বালুচদের সংখ্যা মাত্র ৪৮ ভাগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগান পাখতুন উপজাতি গোষ্ঠী এই স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহী নয়। আবার বালুচরাও তিনটি গোষ্ঠীতে বিভাজিত। সেই সঙ্গে বালুচরা পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান তিন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। ফলে ইরান বা আফগানিস্তান কেউই স্বাধীন বালুচ রাষ্ট্রের পক্ষপাতী হওয়ার কথা নয়। দুই বৃহৎ শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকা বালুচিস্তান নিয়ে বেশি সক্রিয় নয়। যদিও পাকিস্তানের অভিযোগ ইরাক, রাশিয়া, ইউএই বালুচদের আন্দোলনের সাহায্য যোগায়।

লাককেল্লার প্রাচীর থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বালুচিস্তানের নাম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিভতে থাকা স্বাধীন বালুচিস্তানের আশা যেন আবার জেগে উঠল। বিশ্ব রাজনীতিতে নিঃসঙ্গ পাকিস্তান নরেন্দ্র মোদীর প্যাঁচে একেবারে কাত। তারা জানে, ভারত ১৯৭১ সালে মতো আবারও পাকিস্তানে অস্ত্রোপচার করতে সমর্থ। বিশ্ব রাজনীতিও এখন ভারতে পক্ষে। ধূর্ত চীন সবচেয়ে আগে পাকিস্তানের হাত ছাড়ে। তারা প্রধানমন্ত্রীর বালুচিস্তান প্রসঙ্গ নিয়ে পাকিস্তানের ইচ্ছামতো হুমকি তো দূরের কথা টুঁ শব্দ করেনি, বরং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে চিরাচরিত পাকিস্তানের কাশ্মীর না বলে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বলে সরকারি পত্রিকায় বয়ান দিয়েছে।

অন্য দিকে বালুচ নেতারাও একের পর এক ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছে। কিন্তু কেন? এটা কী কাকতালীয় ঘটনা না এর পিছনে চলছে কূটনীতির বড় কোনো খেলা। আসলে পুরো ঘটনাচক্রের পেছনে রয়েছে ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তি। চীনকে জব্দ করতে আমেরিকা এখন ভারতের দৃঢ় সমর্থক। এন এস সি-তে ভারতের প্রবেশ সাময়িক আটকে চীন খুশি হলেও দক্ষিণচীন নিয়ে আন্তর্জাতিক কোর্টে তার পরাজয় ও আন্তর্জাতিক আইন না মানার ঘোষণা চীনকে একঘরে করে দিয়েছে। ফলে এনএসজি-তে ভারতের প্রবেশ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অন্যদিকে, আমেরিকা জানে গোয়াদর বন্দর তৈরি হলে পশ্চিম এশিয়া তার প্রাধান্য হ্রাস পাবে। ফলে আমেরিকাও চায় অশান্ত বালুচিস্তান। আফগানিস্তান সমুদ্র বন্দরের অভাবে বিশ্ব বাণিজ্যে ব্রাত্য। ফলে স্বাধীন বালুচিস্তান তারও অনুকূল। কিন্তু চীন যে পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করেছে এই বন্দর নির্মাণে সেটা উদ্ধার না হলে চীনা অর্থব্যবস্থা সঙ্কটে পড়বে। তাই তারাও সরাসরি বিরোধিতায় নামবে না। সেই সঙ্গে ভারতে রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিশালী সরকার।

সবচেয়ে বড় কথা, এই দুই বছরে চল্লিশের বেশি দেশ ভ্রমণ করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সক্রিয় বিদেশনীতি চীন ও পাকিস্তানের মনে ১৯৭০ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। এটাই স্বাধীন বালুচিস্তানের আশার কেন্দ্র। ■

# পাক-নীতি প্রণয়নে ভারতের সাবালকত্ব অর্জন

**সন্দীপ চক্রবর্তী**

আক্রমণই আত্মরক্ষার সেরা উপায়। এই প্রবাদটি সকলেই কমবেশি শুনে থাকবেন। প্রবাদটিকে ব্যাখ্যা করলে মোটামুটি এইটুকু বোঝা যায়, আক্রান্ত হলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সদাসক্রিয় থাকতে হবে এবং মাঝে মাঝে পাল্টা আঘাত হেনে শত্রুপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যুদ্ধটা আত্মরক্ষার হলেও সেটা যুদ্ধ। প্রতিষ্ঠানিক নিয়মরক্ষা নয়। ইতালির দার্শনিক মেকিয়াভেলি থেকে শুরু করে চীনের যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ সান জু— অনেকেই এই আগ্রাসী আত্মরক্ষা নীতির সমর্থক ছিলেন। ২০০ বছর আগে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে এই নীতির প্রথম বাস্তব প্রয়োগ করেন। আর এক সমর্থক মাও জে দং ১৯৪৯ সালে চীনে বিপ্লব সংঘটিত করার সময় এই নীতি প্রয়োগ করেন।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বিশ্ববরেণ্য নেতাদের তালিকায় নিজের নামটি লিখিয়েছেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লালকেল্লা থেকে প্রদত্ত ভাষণে নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তান তো বটেই, তার দোসর চীন, এমনকী ভারতের সদা উচ্চকিত বিরোধী নেতৃবর্গকে পর্যন্ত স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। সেদিন মোদী বলেন, 'আজ আমি বিশেষ কয়েকটি জনগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ দিতে চাই। গত কয়েকদিনে বালুচিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তানের অসংখ্য মানুষ আমাকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা অনেক দূরে থাকেন, তাঁদের আমি কখনও দেখিনি, চিনিও না— তাঁদের এই শুভেচ্ছা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার এবং দেশের ১২৫ কোটি জনতার শ্লাঘার বিষয়।'

> গত কয়েকদিনে বালুচিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তানের অসংখ্য মানুষ আমাকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা অনেক দূরে থাকেন, তাঁদের আমি কখনও দেখিনি, চিনিও না— তাঁদের এই শুভেচ্ছা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমার এবং দেশের ১২৫ কোটি জনতার শ্লাঘার বিষয়।

ভাষণে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উল্লেখ তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ দেশভাগের পর যে আন্তর্জাতিক মানচিত্র তৈরি হয় তাতে গিলগিট-বালটিস্তানকে ভারতীয় অঞ্চল হিসেবে দেখানো হয়েছিল। প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের স্বীকৃতিও মিলেছিল তাতে। কিন্তু চিরকাল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া সমস্যাদীর্ণ বালুচিস্তানের উল্লেখ করে মোদী পাকিস্তান এবং চীনের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে বালুচিস্তানের মানুষ আজাদির জন্য লড়াই করছেন। তাদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যের ভয়াবহ আক্রমণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংবাদমাধ্যমের কৌশলে এদেশে ততটা পরিচিত নয়। মোদীর উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি রাতারাতি আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর 'নৃশংসতার' পাকিস্তানি অভিযোগের জবাবে এটি মোদীর পাল্টা আঘাত। ভারত যে তার চিরাচরিত প্রতিরক্ষানীতি অর্থাৎ আপোশ-মীমাংসার নীতি বদলে আগ্রাসী আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করতে চলেছে, সেই কথা ঘোষণা করে মোদী স্পষ্টতই পাকিস্তানকে সাবধান করে দিয়েছেন। প্রয়োজনে ভারত আরও নির্মম হতে বাধ্য

হবে। অর্থাৎ এরপর ভারতবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে মদত দেওয়া পাকিস্তানের পক্ষে সহজ হবে না। কারণ বেচাল দেখলেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ জটিলতাকে ভারত বিশ্বমঞ্চে আরও প্রকট করে দেবে।

নতুনতর ভঙ্গিতে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি সেনাপ্রধান রাহিল শরিফের গালে প্রায় বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষিয়েছেন। সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছেন তাঁর অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য। পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ তারা গণতান্ত্রিক রীতিতে নির্বাচিত সরকারকে পুতুল বানিয়ে রেখে নিজেরাই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করে। সেনার বাধার কারণেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। আবার পাকিস্তানি সেনাই সন্ত্রাসবাদীদের আড়ালে গত জানুয়ারিতে ভারতীয় বায়ুসেনার পাঠানকোট ছাউনিতে হামলা চালায়। ভারত প্রথম থেকে বলে এসেছে এই হামলার মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনা আসলে নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে ভারতীয় অঞ্চলের দখল নিতে চেয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মোদীর পদক্ষেপ শুধুমাত্র সাহসী বললে কম বলা হয়। বস্তুত স্বাধীনোত্তরকালে কূটনৈতিক স্তরে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানকে একই সঙ্গে আগ্রাসী এবং দুর্ভেদ্য করার এটাই প্রথম প্রয়াস।

পাকিস্তানের মতো শত্রু মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে মোদী মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ দুটোই দেখেছেন। ভারতের সাম্প্রতিক অন্তঃসারশূন্য বিরোধী রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুরা মোদীর পাকিস্তান নীতিতে সংলগ্নতা-ধারাবাহিকতা নেই বলে অভিযোগ করেছেন। মোদী দমেননি। উল্টে 'ধারাবাহিকতা গর্দভদেরই মানায়' বলে ঠাট্টা করেছেন। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক আধিকারিকের কথাতেও উঠে এসেছে ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গ। তিনি বলেছেন, 'অন্যরা কে কী করছে আপনি সেই সম্পর্কে

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গিলগিট বালটিস্তানে বিক্ষোভ।

## পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট-বালটিস্তান এক নজরে

- গিলগিট-বালটিস্তান ছিল জম্মু-কাশ্মীরের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য।
- ১৯৩৫ সালে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার কাশ্মীরের রাজার কাছ থেকে গিলগিট অঞ্চল ৬০ বছরের জন্য লিজ নেয়। সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গিলগিটের গুরুত্ব ছিল এর কারণ।
- ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীরের রাজা হরি সিং কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে মেনে নিলেন। বৃটিশ অফিসার মেজর ব্রাউন কালক্ষেপ না করে গিলগিটের সেনাবাহিনীকে বন্দি করলেন এবং গিলগিট পাকিস্তানের অংশ বলে সুপারিশ করেন।
- ১৯৭০ সালে জুলফিকর আলি ভুট্টো গিলগিট-বালটিস্তান- সহ সমগ্র অধিকৃত কাশ্মীরের রক্ষাকবচ প্রজারক্ষা আইন বাতিল করেন। বস্তুত এই আইনটির জন্যই ওই অঞ্চলের জনবিন্যাসে একটা সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল। আইন বাতিল হবার পর সুন্নি-ওয়াহাবি মুসলমানরা যথেচ্ছ বসতি স্থাপন শুরু করে।
- পরবর্তীকালে এলাকার ভূমিপুত্র শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য জেনারেল জিয়াউল হকের নেতৃত্বে শুদ্ধিকরণ অভিযান শুরু হয়। যার ফলে আশির দশকে এই এলাকায় সামাজিক এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ চরমে ওঠে। হাজার হাজার নারী এবং শিশুকে হত্যা করা হয়।
- ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের বেশিরভাগ অধিবাসীই সুন্নি মুসলান এবং পঞ্জাবি তাদের মাতৃভাষা। এই এলাকায় কাশ্মীরিরা মাত্র ২০ শতাংশ।
- ১৯৪৭ সালে একটি সংবিধান সংশোধনী দ্বারা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বসবাসকারী মানুষের সমস্ত ন্যায্য অধিকার বাতিল করা হয়।
- এখানকার নির্বাচিত সরকারেরও কোনো প্রশাসনিক গুরুত্ব নেই। কোনোরকম সাংবিধানিক অনুমোদন ছাড়াই পাক অধিকৃত কাশ্মীর শাসন করে এ জে কে সি।
- দেশভাগ আইন অনুসারে গিলগিট-বালটিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

উদাসীন থাকতে পারেন না। পাকিস্তানে পরিস্থিতি যদি বদলে যায় তাহলে আমাদেরও নীতি বদলাতে হবে। যেখানে পাকিস্তান তার কাজকর্মে ধারাবাহিক নয় সেখানে আমরা কীভাবে ধারাবাহিক হতে পারি?'

অথচ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ মে মাসে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তান-সহ প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক প্রত্যাহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সৌহার্দ্যের তাল কেটে গেল। ভারতের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল হুরিয়ত তাস খেলে পাকিস্তান সদভাবনা প্রয়াসের অবমাননা করছে। এরপর ২০১৫-র জুলাই। রাশিয়ার উফায় মোদী এবং শরিফের বৈঠক সামান্য আশার আলো দেখালেও তা স্থায়ী হয়নি। দু' দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রেও দায়ী পাকিস্তান। সে দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টা দলের প্রধান সারতাজ আজিজ দিল্লীর বৈঠকে এসে হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কিনা, সেই নিয়ে যখন জোর চর্চা চলছে ঠিক তখনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় বৈঠকে কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি ভারত বরদাস্ত করবে না।

২০১৫-র নভেম্বর। প্যারিসের আবহাওয়া পরিবর্তন শীর্ষ বৈঠকে নওয়াজ শরিফের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটল। সেই সঙ্গে শুরু হলো দু'দেশের সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সারতাজ আজিজকে পাশে নিয়ে জানালেন ভারত পাকিস্তান দুই দেশই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। আলোচনার প্রস্তাবনায় ভারতই জোর করে 'দ্বিপাক্ষিক' শব্দটি ঢোকায়। উদ্দেশ্য, হুরিয়ত নেতাদের এই আলোচনা থেকে দূরে রাখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুম্বই বিস্ফোরণের পর পাকিস্তানের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বন্ধ ছিল। এনডিএ সরকারের উদ্যোগে আবার তা শুরু করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান এমন একটি দেশ যার সঙ্গে শুধু সাপের তুলনা চলে। পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঠিক তখনই ঘটল পাঠানকোটের সেনাছাউনিতে হামলা।

পাঠানকোটের হামলায় মোট আটজন ভারতীয় মারা যান। এদের মধ্যে সাতজন নিরাপত্তারক্ষী। এছাড়া চারজন জঙ্গিও মারা যায়। হামলাকারীরা যে পাকিস্তানের নাগরিক সেকথা পাকিস্তান অস্বীকার করেনি। তাদের অভিযোগের আঙুল ছিল জইশ-ই-মহম্মদের দিকে। এমনকী নওয়াজ শরিফ গুজরানওয়ালা থানায় ভারতের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এফ আই আর দায়ের করেন। ২০১৬-র এপ্রিলে পাকিস্তানের তদন্তকারী সংস্থাকে (জে আই টি) পাঠানকোটে তদন্ত করতে আসার ব্যাপারে ভারত সবুজ সঙ্কেত দেয়। অথচ পাঠানকোট ইস্যুতে ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ভারত যখন তদন্তের স্বার্থে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তদন্তকারী দল পাঠানোর কথা বলে পাকিস্তান তা অগ্রাহ্য করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল বাসিত অভিযোগ করেন ভারত নাকি চুক্তিভঙ্গ করে নওয়াজ শরিফকে অপদস্থ করতে চাইছে। তথ্য আদানপ্রদানের কোনো শর্ত নাকি চুক্তিতে ছিল না। যাইহোক, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দু'রকম ব্যবহারের নেপথ্যে যে দুই শরিফের ইগোর লড়াই সেটাও এই সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। অন্যজন সেনা প্রধান রাহিল শরিফ।

উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং সোয়াট অঞ্চলে তালিবানদের বিরুদ্ধে সফল সেনা অভিযানের পর রাহিল শরিফ পাকিস্তানে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। সিন্ধুপ্রদেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করা এবং করাচি শহরে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও তার হাত রয়েছে। রাহিল শরিফের মেয়াদ এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত। নওয়াজ শরিফ সরকার তার কার্যকাল আরও বাড়াবে কিনা সেটা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। কারণ দুই প্রধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নওয়াজ শরিফ নরেন্দ্র মোদীর প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করেন কিন্তু রাহিল শরিফ ঠিক তার উল্টো। কতকটা এই উল্টো অবস্থানের জন্যই চীন পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে সেনাপ্রধানকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরেই চীন পাকিস্তান ইকনমিক করিডোর নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছে। এর জন্য খরচ হবে ৪৬০ কোটি মার্কিন ডলার। এই করিডোরে থাকবে একটি হাইওয়ে যা চীনের কেশগড় থেকে শুরু হবে। তারপর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তান হয়ে বালুচিস্তানের গোয়াদরে শেষ হবে। এছাড়া এই প্রকল্পে ১০,৪০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মতো বিতর্কিত অঞ্চলে হাইওয়ে নির্মাণের তীব্র প্রতিবাদ করেছে ভারত। কয়েক মাস

আগে রাহিল শরিফ চীনে গিয়েছিলেন। আলোচনায় তিনি আশ্বাস দেন করিডোর নির্মাণ শুরু হলে পাকিস্তানি সেনা তার নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ সরাসরি তিনি ভারতকে চ্যালেঞ্জ করছেন। ওদিকে চীনও শরণাগতকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি এনএসজি-র বৈঠকে ভারতের নাম সমর্থন না করা এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাকিস্তানের নাম প্রস্তাব করা, দুই দেশের পারস্পরিক কূটকৌশলেরই বহিঃপ্রকাশ।

এমতাবস্থায় নরেন্দ্র মোদীর মুখে বালুচিস্তান প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বালুচিস্তান পাকিস্তানের সব থেকে বড়ো এবং সব থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য। মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার একেবারে সংলগ্ন হওয়ায় এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বাড়াতে চীন সম্প্রতি যে অর্থনৈতিক করিডোর নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল বালুচিস্তান। গোয়াদর বন্দরের আধুনিকীকরণে বিপুল বিনিয়োগের পাশাপাশি চীন বালুচিস্তানের সোনা ও তামার খনি লিজ নিয়েছে। সুতরাং চীনের কাছে বালুচিস্তান সোনার ডিম পাড়া হাঁস। আবার পাকিস্তানের কাছেও একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী ২৫০০ কিমি সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পুরোটাই বালুচিস্তানে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা দীর্ঘকাল ধরে ওই দুটি দেশে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু শাসকের তৈরি এই নেতিবাচক পরিমণ্ডলে কেমন আছেন সাধারণ বালুচরা? উত্তর, খুবই খারাপ। ১৯৪৮-এ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পর থেকেই বালুচরা স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমন করার নামে বারবার নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিত্যনতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে।

ইতিহাস বলছে, পাকিস্তান জোর করে বালুচিস্তান দখল করেছিল। এখানকার মানুষ পাকিস্তানের নাগরিক হতে চাননি। সেই সময় থেকেই বালুচ-রা পাকিস্তানের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে এককাট্টা। এই লড়াই-এ এখনও পর্যন্ত ২০ হাজার বালুচ নিখোঁজ। বেসরকারি সূত্রের খবর, তাদের নির্মমভাবে অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে। তবুও বালুচ-রা যুদ্ধ ছাড়েননি। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করছেন।

পাকিস্তান প্রায়শই অভিযোগ করে বালুচিস্তানে অশান্তির পিছনে রয়েছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র (RAW)। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো প্রমাণ তারা দিতে পারেনি। ২০০৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রেজা গিলানির অভিযোগের উত্তরে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্তিমিত প্রতিক্রিয়া দেশকে লজ্জায় ফেলেছিল। প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিন্দুমাত্র নাক না গলিয়ে এবং আশার অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিবেশীর অবস্থা ও অবস্থান

## সম্পর্কের ওঠা-নামা

**মে ২৬, ২০১৪**

নরেন্দ্র মোদী তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রিত হলেন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানেরাও।

**আগস্ট ১৯, ২০১৪**

কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের অতিরিক্ত হৃদ্যতার কারণে ভারত দু'দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল করল।

**জুলাই ১০, ২০১৫**

নরেন্দ্র মোদী এবং নওয়াজ শরিফ রাশিয়ার উফা শহরে মিলিত হলেন এবং দুই নেতাই সমস্ত রকমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মাত্র এক মাস পর ভারত যখন সন্ত্রাস প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইল তখন পাকিস্তানের এন এস এ তাদের দিল্লী সফর বাতিল করল।

**ডিসেম্বর ২৫, ২০১৫**

নওয়াজ শরিফের পৌত্রীর বিবাহে নরেন্দ্র মোদী যোগদান করলেন। এর এক সপ্তাহ আগে ভারত এবং পাকিস্তান সন্ত্রাসবিরোধী দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছিল।

**জানুয়ারি ০২, ২০১৬**

পাকিস্তানের চারজন সন্ত্রাসবাদী পাঠানকোটের সেনাছাউনি আক্রমণ করল। ৭ জন নিরাপত্তারক্ষী মারা গেলেন। ভারত-পাক যৌথ তদন্তকারী দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করল। এপ্রিল মাসে সমগ্র শান্তি প্রক্রিয়া প্রত্যাহৃত হলো।

**জুলাই ০৮, ২০১৬**

নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে হিজবুল মুজাহিদিন কম্যান্ডার বুরহান ওয়ানি মারা গেল। পাক মদতে সুন্নি মুসলমানদের একাংশ প্রতিবাদে-বিক্ষোভে উত্তাল করে তুলল উপত্যকা। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরে মারা গেলেন বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী। নওয়াজ শরিফ বুরহান ওয়ানিকে শহিদের মর্যাদা দিলেন এবং ঘোষণা করলেন পাকিস্তান 'কালা দিবস' পালন করে কাশ্মীরিদের আজাদির লড়াইকে সমর্থন করবে।

**আগস্ট ১৫, ২০১৬**

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে নরেন্দ্র মোদী গিলগিট-বালটিস্তান এবং বালুচিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বললেন। ভারত কূটনীতির লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করছে বলে প্রতিবাদ করল পাকিস্তান। এও জানাল বিষয়টি যত শীঘ্র সম্ভব রাষ্ট্রপুঞ্জের গোচরে আনা হবে।

বুঝিয়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদী পূর্বসূরির দেওয়া লজ্জার প্রতিকার করলেন বলা চলে।

বস্তুত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে কথা বলার অধিকার যে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের আছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত এবং সহানুভূতিশীল। বিশ্বের যে প্রান্তেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটুক জনসমক্ষে তা তুলে ধরা ভারতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী সেটুকুই করেছেন। কারণ না করে উপায় ছিল না। ইরান এবং আফগানিস্তানের বালুচ-রা যদি পাকিস্তানের বালুচদের পাশে দাঁড়িয়ে একযোগে বালুচিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করে তাহলে ভারতের দ্বারপ্রান্তে যে আগুন জ্বলবে তা থেকে রেহাই পাওয়া অসম্ভব। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে সেই আগুন। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

সুতরাং বিশ্বের এই অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে ভারতের তা রাষ্ট্রপুঞ্জের নজরদারিতে আনা উচিত। যাতে আমেরিকা এবং সৌদি আরবের মতো যে সব রাষ্ট্র পাকিস্তানকে 'নৈতিক কারণে' সাহায্য করে থাকে তা বন্ধ হয়। ভারত যে বালুচ স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সামরিক সাহায্য দেওয়ার কথা ভাবছে না তা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। ভারতের উদ্দেশ্য দুটো। পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান দ্বিচারিতার সমুচিত কূটনৈতিক জবাব দেওয়া এবং বালুচিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্য যে অত্যাচার চালাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দুটি উদ্দেশ্যেই সফল হয়েছেন। ভারতের সদ্য সাবালক হওয়া পাকিস্তান নীতি আরও কত ফুল ফোটায় এখন শুধু সেটাই দেখার।

*(তথ্যসূত্র : অর্গানাইজার এবং ইন্ডিয়া টুডে)*

# মুখোশের আড়ালে ঘাতকের মুখ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** এদিকে লাদাখ। আর পশ্চিমে সীমান্তপারের দুই জেলা পুঞ্চ এবং রাজৌরি। এখানকার মানুষ এখন উল্লসিত। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা। কারণ সর্বদলীয় বৈঠক এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। পাকিস্তানি সৈন্যের মধ্যযুগীয় অত্যাচারে বিপর্যস্ত এখানকার মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিতে আপ্লুত সবাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ইতিমধ্যেই পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিট-বালটিস্তান এবং কাশ্মীরের মানুষের অভিশপ্ত জীবনযাপনের ছবি আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কার্গিলে বসবাসকারী শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সঙ্গে পাক অধিকৃত গিলগিট-বালটিস্তান এবং কাশ্মীরের মানুষের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় সাদৃশ্য রয়েছে। নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে শিয়াদের বহু আত্মীয়স্বজন থাকেন। এতদিন তাঁরা আপনজনেদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যের নির্মম অত্যাচারের গল্প শুনতেন। এই প্রথম কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন। সুতরাং আনন্দ তাঁদের হবারই কথা। গিলগিট-বালটিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের ওয়াশিংটন-নিবাসী ডিরেক্টর সেঙ্গে হাসান সেরিং তাঁর আশা এবং আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'গিলগিট-বালটিস্তান, পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং বালুচিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা অনেক দিন ধরে এই অঞ্চলের সমস্যার অংশীদার প্রতিটি রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছি।' সেরিং স্পষ্টতই বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেবার দাবি জানিয়েছেন এবং একমাত্র তাতেই পাকিস্তানি সৈন্যের বর্বরতা বন্ধ হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করা উচিত। কারণ গিলগিট-বালটিস্তানের মানুষ রক্তলোলুপ যুদ্ধাপরাধীদের হাতে নির্যাতিত হতেই থাকবে যদি না প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র এগিয়ে আসে।' তাঁর যুক্তি, 'এই সমস্যার ফলে ভারতের নিরাপত্তাও প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হচ্ছে। সুতরাং ভারতের উচিত সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।'

কার্গিলের শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতারাও মোদীর সহানুভূতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। কার্গিলে প্রধান ধর্মীয় সংগঠন দুটি। ইসলামিয়া স্কুল এবং ইমাম খোমেইনি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৭-র আগে গিলগিট-বালটিস্তান ছিল স্বাধীন ডোগরা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৮-র যুদ্ধে পাকিস্তান অন্যায় ভাবে এই অঞ্চল দখল করে। স্বাধীনোত্তর ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রীই দখলমুক্ত করার চেষ্টা করেননি।

এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক সাংসদ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে মুখর, হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সেনেটর জন করনাইন, জন ম্যাককেইন, মার্ক ওয়ার্নার এবং হাউজ অব রেপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য বারবারা কমস্টক। মানবাধিকার আন্দোলনের নেতারাও পাকিস্তানকে 'দখলদার রাষ্ট্রে' তকমা দিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকবছর আগে জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশন্যাল লিবারেশনের রাওয়ালপিণ্ডিতে নিজের বাড়ির সামনে খুন হন। এই হত্যার পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার হাত আছে বলে অভিযোগ। রাজনীতির বাইরে শহিদ ছিলেন লেখক। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তিনি বারোটির বেশি বই লিখেছেন। এই হত্যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শহিদ ছিলেন সামরিক অত্যাচার এবং সুন্নি-ওয়াহাবি সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ। বালুচিস্তানের মতো গিলগিট-বালটিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরেও পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা অপরহরণ ধর্ষণের মাধমে মানুষের প্রতিবাদী চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। শহিদ এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলছিলেন। তাই তাঁকে চুপ করিয়ে দেওয়া হলো।

এই অবস্থায় নরেন্দ্র মোদী ভীত হতাশ মানুষগুলোর সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। সেনা পাঠিয়ে গিলগিট-বালটিস্তান বা কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানকে হটিয়ে দেওয়া হয়তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তা না করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করে যেভাবে মোদী কূটনৈতিক আলোড়ন ফেলে দিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কতকটা তাঁর মন্তব্যের পরেই ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিলগিট-বালটিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল বের করা হয়। তার মধ্যে জার্মানিতে বিক্ষোভ বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। ■

# চিঠিপত্র

## বিধর্মীর সঙ্গদান মৃত্যুর ঠিকানা

গত ১৪ আগস্টের সাত সকালে কাঁথা কম্বল জড়ানো স্ত্রীলোকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় খোদ কলকাতার আলিমুদ্দিন ও রিপন স্ট্রিটের মোড়ে একটা হোটেলের সামনে। পুলিশ সূত্র অনুসারে, নিহত মহিলার নাম সোমা দাস। তাঁর শ্বশুর বাড়ি হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। একবছর আগে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসেন। তিন বছরের একটা কন্যাসন্তানও বর্তমান। কলকাতার বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা শেখ রিজওয়ান, কয়েকবছর পূর্বে ডাকাতির কেসে ধরা পড়ে জেলও খেটেছেন। রিজওয়ানের সঙ্গে সোমার পরিচয় হওয়ার সুবাদে তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ও বিভিন্ন হোটেলে নিয়ে গিয়ে যৌনকর্মী হিসাবে সোমাকে ব্যবহার করে। সোমা যৌনকর্মী হিসাবে বাঁচতে চায়নি, সে রিজকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। রিজও ধুরন্ধর। সোমাকে নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে। সে ইতিপূর্বে কয়েকবার হোটেল এসেছে, হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপও আছে। শুক্রবার রাতে উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়, রাত্রিতে সোমাকে খুন করে সিলিং ফ্যানে টাঙিয়ে রেখে হোটেল ছেড়ে পালায়। ভোরে হোটেলের ম্যানেজার জানতে পারে সোমার দেহ ফ্যানে ঝুলছে। হোটেলের দুর্নাম হবে ভেবে ম্যানেজার সৌমেন মিত্র শেখ রাজু নামে এক হোটেলকর্মী ও কদরবানু নামে এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে মৃতদেহ কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই রাস্তায় ফেলে রাখে।

একজন মুসলমান হিন্দু মেয়ের ইজ্জত লুট করে খুন করলো, এর জন্য বর্তমান সরকারের কোনো হেলদোল নেই, অথচ কয়েকবছর আগে— রিজানুর নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ রেললাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী যিনি বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। আর অন্য রিজওয়ান যখন সোমা দাসকে হত্যা করলো, তাঁর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল পড়েছে কী? উত্তর অবশ্য সকলের জানা।

**—কুমারেশ বিশ্বাস,**
ঘোলা, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা-১১১।

## শহিদ নয়, হুতাত্মা

ভারতে মুসলমান আগমনের সময় থেকেই অনেক মুসলমানি শব্দ ভারতীয় সাহিত্যের অনুপ্রবেশ করেছে, তেমনি পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়াতেও অনেক মুসলমানি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু একটি মারাত্মক শব্দ অনুপ্রবেশের ব্যাপারে ভারতীয় মনীষীগণ একদম মাথা ঘামাননি, শব্দটি হলো 'শহিদ'। ইংরেজ আগমনের পর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, অথবা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন তাদেরকে 'শহিদ' উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। যথা— শহিদ ক্ষুদিরাম, শহিদ বিনয়-বাদল- দিনেশ, শহিদ ভগৎ সিং, রাজগুরু। আমার মতে এঁদের নামের আগে শহিদ শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত। মুসলমান ধর্মগ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে, শহিদ হলো সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ কাজে নিহত হয়। শহিদ হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে ধর্মের জন্য মারা যায়। শহিদের জন্য আল্লাহ বেহেস্তে অফুরন্ত সুরা এবং নারীভোগের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এখানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কুরআন হদিসের আলোকে শহিদ কারা' বই থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'কাফের, মুশরিক, অমুসলমান, বেইমান ও মুনাফেক নিহত হলেও তাদেরকে শহিদ বলে উপাধি দিয়ে সমাধিগুলোতে কতরকম শিরকবিদয়াত কার্য করে যাচ্ছে।' আমার মতে এই 'শহিদ' শব্দের প্রতিশব্দ খুঁজে বের করার সময় এসেছে। আমার বিদ্যাবুদ্ধি মতো একটা প্রতিশব্দ খুঁজে পেয়েছি যা হলো হুতাত্মা। এর থেকেও কোনো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা জানার জন্য বিদগ্ধ জনের নিকট আবেদন জানাচ্ছি

**—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

## তৃণমূল কংগ্রেস এবং হিন্দু ভোট

বলা হয় পশ্চিমবাংলায় মুসলমান ভোট ৩০ শতাংশ। তাই মমতা ব্যানার্জির পক্ষে কোনোভাবেই এনডিএ-তে যোগদান করা সম্ভব নয়। কারণ এনডিএ-র প্রধান শরিক বিজেপি আর মুসলমানরা কোনোক্রমেই বিজেপিকে ভোট দেবে না। এদিকে ধরা হচ্ছে যে ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট সবই মমতা ব্যানার্জি পাচ্ছেন।

সত্যই কি এবার বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৫ শতাংশ পেয়েছে এবং ধরা যাক ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট সবই তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে। তাহলে এই ৪৫ শতাংশ ভোটের মধ্যে মুসলমান ভোট ৩০ শতাংশ হলে বাকি থাকে মাত্র ১৫ শতাংশ হিন্দু ভোট। তবে কি ধরে নিতে হবে যে মমতা ব্যানার্জি এই ১৫ শতাংশ হিন্দু ভোট আর ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট পেয়ে ২১১টি আসন পেয়েছেন? বাস্তব কিন্তু তা নয়। এই ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের অধিকাংশ যে তাঁর ঝুলিতে যায়নি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্যাপক তোষণ নীতি চালিয়েও মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের মতো মুসলমান অধ্যুষিত জেলায় মুসলমান ভোটাররা তৃণমূলকে ভোট দেয়নি। তাই সন্দেহ হয় এই মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলি বাদে অন্য জেলায়ও মুসলমানরা ঢেলে তৃণমূলকে ভোট দেয়নি। প্রার্থী মুসলমান হলে তাঁকে ভোট দিয়েছেন, তৃণমূল বলে নয়। সব মিলিয়ে ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের ৭/৮ শতাংশ তৃণমূল পেয়েছে কিনা সন্দেহ হয়। ১৫ শতাংশ নয় প্রধানত সিংহভাগ হিন্দু ভোট পেয়ে তৃণমূল ২১১টি আসন পেয়েছে।

তাই মমতা ব্যানার্জির পক্ষে দিনরাত সংখ্যালঘু- সংখ্যালঘু বলে চীৎকার করা শোভা পায় না।

**—সুহাস বসু,**
বেহালা, কলকাতা-৭০০০৬০।

# রাজ্যের নাম পাল্টানোর চেষ্টা ইতিহাস বিচ্ছিন্নতা

কে. এন. মণ্ডল

রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিরিখে 'বাংলা' বা 'বাঙালির' পরিসীমা মুখ্যত অবিভক্ত বাংলাই। বাঙালি জাতি অবিভক্ত— এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষকে নিয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিষময় পরিণতি হিসেবে বাংলার আকৃতি খণ্ডিত বা পরিবর্তিত হলেও এপার বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ওপার বাংলার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিগূঢ়তম যোগসূত্র অব্যাহত রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলেও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি দু'ভাগ করা যাবে না, যদিও এর ভৌগোলিক সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনের অনেকটা সময় ধরে বর্তমান পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশ ছাড়াও অসমের কাছাড়, গোয়ালপাড়া, বিহারের পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চল প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি মতানুসারে 'বঙ্গ' শব্দটি কোল-মুণ্ডাদের 'বোঙ্গা' দেবতার নাম থেকেই আসছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন শশাঙ্কের 'গৌড়বঙ্গ' থেকেই বাংলার উদ্ভব। বঙ্গ মূলত গঙ্গার পূর্বদিকে সুদূর পূর্ব বাংলাকে নিয়ে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে 'বাংলা' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় বলে মত অনেকের। সে যা হোক, বাঙালি ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বৃটিশ শাসন-শোষনের টানাপোড়েনে এবং তা আবেগোচ্ছ্বসিত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে।

এটা অনস্বীকার্য যে, বৃটিশ শাসন বাঙালিদের শুধু একটি ভৌগোলিক সীমাই প্রদান করেনি, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই সময় বাঙালিদের উত্থান ঘটে। বাঙালি জাতীয়তার উপর ভর করেই ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে বাঙালি তার পরিচয়ের যথার্থতা খুঁজে পায়। অষ্টাদশ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালি তার অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এ সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিল্পে বাঙালিদের জয়জয়কার। বিশিষ্ট বাঙালি যাঁরা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে মহিমান্বিত করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কবি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, নন্দলাল বসু, নেতাজী সুভাষ, ঋষি অরবিন্দ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ। এঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে সমস্ত বাঙালি এক মন-এক প্রাণ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়েছে। তাই, পরম প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ করেও রণে ভঙ্গ দিতে হয়। পরিশেষে, কিছু বিভেদকামী, প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী চক্রান্তের কাছে বাঙালি জাতীয়তা হার মানে— বাঙলা বিভক্ত হয়। বাঙলার গৌরবশশী রাহুগ্রস্ত হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। না, সে দিনটা বাঙালিদের উদযাপনের দিন নয়— বাঙালি জাতির কফিনে শত শত পেরেকে ছিন্ন-ভিন্ন দেহ থেকে আজও তপ্ত-শোণিত বহমান। আর, যারা একাজের নায়ক, ইতিহাস তাদেরও ক্ষমা করেনি— কিন্তু যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছে, তা আজও বিষময় ফল ফলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই আমরা— আমরা কি আজ ইতিহাস, ঐতিহ্য, অতীত গৌরব সম্পূর্ণ বিস্মৃত? ইতিহাস থেকে কি কোনোই শিক্ষা নেব না আমরা? রাজ্যের নাম পাল্টে আমাদের ক্লীবতার যতিচিহ্ন টেনে আগামী প্রজন্মকে অতীতের জন্য শ্লাঘা বোধ থেকে বঞ্চিত করবো? জার্মানি, ভিয়েতনামের উদাহরণ সামনে থাকতেও ভবিষ্যতের সব দরজা বন্ধ করার অধিকার কি আমাদের আছে? নইলে পশ্চিমবাংলার 'পশ্চিম' বাদ দেওয়ার কেন এই প্রয়াস? যদি একটি শিশুও প্রশ্ন করে পশ্চিমবাংলার পূর্ব কোথায়— তার উত্তর দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হলেও, তাতে পাপ নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইতিহাস থেকে বঞ্চিত করা পাপ এবং অন্যায়— এটা আমরা করতে পারি না। এরকম হলে, একমাত্র গবেষক ছাত্র ছাড়া অন্যরা জানতেই পারবে না— 'কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম এই আমি।' ইতিহাস বর্জিত কোনো জাতি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তো দূরস্থান— দেশের ভিতরেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান নেই বাঙালির। আর এই চিন্তার দীনতা থেকেই আমরা প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। জাফনায় প্রবাসী তামিলদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তামিলেরা বিক্ষোভে সোচ্চার হয়, পূর্ববঙ্গে নিজদেশে পরবাসী ভাইদের উপর নির্যাতনে বাঙালিরা নির্বাক দর্শক। অথচ, প্যালেস্টাইনের ভাইদের দুর্দশায় কাতর। লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনেরা আজও যারা পরিচয়হীন অবস্থায় রেললাইনের ধারে বা অন্যত্র ঝুপড়িবাসী— 'বাঙলার' নাম পরিবর্তনে এদের কি কোনো উপকার হবে— না পশ্চিমবঙ্গবাসীর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে? বরং পশ্চিমবঙ্গের জ্বলন্ত সমস্যা— কর্মসংস্থান, জলসেচ ও নিকাশী ব্যবস্থায় সরকার মনোনিবেশ করলে মানুষের উপকার হবে।

রাজ্যের নাম পাল্টানোর উদ্যোগ অতীতেও হয়েছে— বিতর্কও হয়েছে, পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়েছে। নতুন করে বিষয়টিকে খুঁচিয়ে তোলার পিছনে কোনো জোরালো যুক্তি নেই— আছে ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা বা ভবিষ্যতে ইতিহাসের পথ ধরে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পথ বন্ধ করার অপচেষ্টা। পশ্চিমবাংলার (West Bengal) নাম ইংরেজি বর্ণমালার শেষে হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের আহুত বৈঠকে, শেষে বলার সুযোগে পশ্চিমবাংলার বক্তব্যের ধার কমে না। তাই যদি হোত, বিশ্বসভায় USA-এর বক্তব্য শোনার লোক থাকত না। অতএব, রাজ্যব্যাপী কোনো বিতর্ক ছাড়াই মন্ত্রীসভায় রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাব গ্রহণ অনৈতিক। পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে— তেমনি 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটিও একটি কলঙ্কময় ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষত বহন করছে, ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া চলে— লুকিয়ে রাখা নয়।

*(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ আধিকারিক)*

# প্রতীকী গণপতি

## সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশ

ওঁ বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্য কোটি সমপ্রভ।
নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্ব কার্যেষু সর্বদা।।

ভারতবর্ষের বিশেষভাবে ব্যবসায়ী মানুষরা প্রতিদিন এই মন্ত্রে তাঁদের দিন শুরু করেন। কখন ও কবে থেকে শ্রীগণেশ চতুর্থী পর্ব শুরু হয়েছে তা প্রায় অজানা। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে সর্বশ্রেণীর হিন্দু সাধারণের সহায়তা লাভ করে সর্বসিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশ চতুর্থী উৎসব সার্বজনিকভাবে চালু করেন। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে পারিবারিক পূজা হিসেবে সীমিত হয়ে পড়ে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বালগঙ্গাধর তিলক দেশের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করতে আবার শ্রীগণেশ চতুর্থী উৎসবকে সার্বজনিক রূপদান করেন। তিনি গণেশকে ‘জনগণের প্রতিভু’ (দ্য গড ফর এভরিম্যান) বলে ব্যাখ্যা করলেন। গণেশপূজা আবার সার্বজনিক রূপ গ্রহণ করলো।

# বঙ্গদেশের মুসলমান সাধক ও কবি

**দেবপ্রসাদ মজুমদার**

বৃহদ্‌বঙ্গে যে সকল ভক্ত সাধক ও আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অনেক হিন্দু-ভাবাপন্ন মুসলমান সাধকের নাম আছে। ওই সকল মুসলমান সাধকের বেশিরভাগই ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। এছাড়া কিছু আত্মজ্ঞানী যোগী ও ভক্ত পুরুষেরও নাম পাওয়া যায়। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সময় ও তৎপরবর্তীকালে বাংলার জাতীয় জীবনে যে ভক্তিভাবের প্লাবন দেখা দিয়েছিল, ওই প্লাবন শুধু হিন্দুদেরই নয় সমভাবে মুসলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। এই সকল বৈষ্ণব মুসলমান সাধকের অনেকেরই জীবনের ঘটনা ও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আর যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাও যথোপযুক্ত নয়, কিন্তু তাঁদের প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান বিষয়ক বাণীগুলি তাঁদের অমর করে রেখেছে সন্দেহ নেই। লক্ষণীয়, অনেক বৈষ্ণব মুসলমানের কথা ও বাণী এখনও সঙ্গীতাকারে প্রচলিত আছে এবং হিন্দুদের মন্দিরে ভজনকালে ওই সকল পদ কীর্তন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বৃহৎবঙ্গে অনেক মুসলমান কবির রচিত হিন্দু দেবদেবী বিষয়ক পদ, গান ও ভজন প্রচলিত আছে। ওই সকল কবির অনেকেই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন ও হিন্দু দেবদেবী অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য দরাফ খাঁ রচিত গঙ্গাস্তোত্র'— যা হিন্দুরাও আবৃত্তি করে থাকেন। এছাড়া কাসেম আলির 'রাধা বিরহ', পরাগল খাঁর 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' প্রভৃতি রচনা এদেশে প্রচলিত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়। আধুনিককালে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত হিন্দু দেবদেবী বিষয়ক গানগুলি নানা স্থানে গীত হয়।

বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের সমকালে একমাত্র যবন হরিদাসের নাম আমরা পেয়ে থাকি, তবে তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বর্তমান বাংলাদেশের হাছন রাজা চৌধুরী নামে এক মুসলমান সাধকের নাম পাওয়া যায়। বাংলা ১২৬১ সালে শ্রীহট্টে ওই সাধকের জন্ম হয়। রামপাশায় তাঁর নাকি বিরাট জমিদারি ছিল। কিন্তু তিনি ফকিরি নিয়ে হিন্দুদের দেবী সম্বন্ধে বহু পদ রচনা করেন। তাঁর 'হাছন উদাস' এমনি নানা পদের সংগ্রহ। তিনি শ্রীরাধাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—

"আমি তোমার কাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙ্গালী।
তোমার লাইগা কাইন্দা ফিরে
হাছন রাজায় বাঙ্গালী গো।।"

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আফজল আলি নামে এক মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। এছাড়া আমান, আবদুর রহিম খান, আলম প্রমুখ কয়েকজন বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে তথ্য না পাওয়া গেলেও তাঁদের কিছু কিছু পদ এখনো পাওয়া যায়। সৈয়দ আলাওল সাহেব নামে এক কবির নাম পাওয়া যায় যিনি খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ছিলেন এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু পদ রচনা করেছেন। এছাড়া চট্টগ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব পদকর্তা আলি মহম্মদের পদও পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বংশখালি থানার অধীন ওশখাইন গ্রামের আলিরাজা নামে এক বৈষ্ণব পদকর্তার আবির্ভাব হয়, যাঁর রচিত শাক্তপদাবলী এখনও বিদ্যমান। উৎকল দেশীয় এক মুসলমান সুবাদার ছিলেন অহম্মদ বেগ। তিনি বানপুরে বাস করতেন, তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত দুষ্ট যবন ছিলেন এবং হিন্দু পীড়ন করতেন। কিন্তু মত্তহস্তীর দলন দেখে তিনি শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শরণ গ্রহণ করেছেন। এবাদোল্লা নামে এক বৈষ্ণব পদকর্তার পদ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না।

নবদ্বীপে মৌলানা সিরাজুদ্দিন নামে এক মুসলমান শাসক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে কীর্তন নিষিদ্ধ করেন। পরে তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে হরিনাম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব জগতে এটা শ্রীচৈতন্যের 'কাজি দলন' নামে খ্যাত। বর্তমান দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটে আড়িয়াদহে কাজিসাহেব নামে এক মুসলমান বাস করতেন। তাঁকে এঁড়েদার দাস গদাধর হরিনাম উচ্চারণ করান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে কুতুবউদ্দিন নামে এক যবন দস্যুর কথা জানা যায়। শ্রীনিত্যানন্দ গৃহিণী জাহ্নবা দেবী যখন নবদ্বীপ থেকে শ্রীবৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন, তখন ওই যবন দস্যু দলপতি সদলবলে জাহ্নবা দেবীর সমস্ত দ্রব্যাদি লুঠ করবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু দেবীর মহিমায় ওই যবন দস্যুরা সারারাত্রি ধরে ঘুরে বেড়িয়েও কোনোভাবে দেবীর কাছে পৌঁছতে পারেনি। ক্রমে সকাল হলে তাদের চৈতন্য হয় এবং দেবীর মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। তখন তারা সকলে অস্ত্র ফেলে দেবীর পদতলে পড়ে কাঁদতে থাকে এবং দেবীর অনুগ্রহে অনুচর-সহ কুতুবউদ্দিন বৈষ্ণব সাধকে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রেমভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে— শুনি ঠাকুরাণী হরিষ অন্তরে/ অনুগ্রহ করিলেন সব যবনেরে।।/ হেনকালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়।/ সকল যবন নাচে কৃষ্ণগুণ গায়।।

নসির মামুদ নামে মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর ১৩৩৯ সংখ্যক পদটি তাঁর রচিত। এটি ব্রজবুলিতে রচিত গোষ্ঠলীলা বিষয়ক পদ। এছাড়া নাজির নামে এক বৈষ্ণব কবি ছিলেন 'হিন্দ কে মুসলমান কবি' গ্রন্থে তাঁর রচনা স্থান পেয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৃন্দাবন ভ্রমণ করে

ফেরার সময় বিজলি খাঁ নামে এক পাঠানের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কৃপায় ওই যবন কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে। তার নাম হয় রামদাস পাঠান। ওই রামদাস পাঠান পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানে নামগান করতেন ও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রচার করেন বলে জানা যায়।

মালবেগ নামে এক উৎকলবাসী মুসলমান বৈষ্ণব কবির কথা জানা যায়। পুরীর সন্নিকটে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। 'পদকল্পতরু'তে তাঁর তিনটি পদ পাওয়া যায়। বিপ্ররাম দাস কবির রচিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তিতে' উৎকল ভাষায় তাঁর জীবন রচিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে 'পতিতপাবনাষ্ট' তাঁর রচনা। এছাড়া ঘোষটিকুরী গ্রামের শাহ আবদুল্লা নামে এক সিদ্ধ ফকিরের নাম পাওয়া যায়। তিনি বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের পানুয়া গোপালের প্রভাবে মুগ্ধ হন ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। সাহাসুজা নামে ওড়িশাবাসী এক বৈষ্ণবের উল্লেখ পাওয়া যায়— তিনি রসিকানন্দের স্তবাদি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

শের খাঁ নামে এক পাঠান শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্য দাস। তিনি সম্ভবত ওড়িশার অম্বুয়া বীরেন্দা পরগনার শাসনকর্তা ছিলেন। একদিন শ্রী শ্যামানন্দ সদলবলে কীর্তন করতে করতে যাওয়ার সময় তিনি কীর্তন বন্ধের আদেশ দেন। পরে তিনি শ্রী শ্যামানন্দের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন ও শ্রী শ্যামানন্দের স্তব স্তুতি করেন। সৈয়দ মরতুজা ছিলেন একজন মুসলমান ফকির। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে আস্থাশীল এবং তান্ত্রিক সাধনায় নিরত ছিলেন। বৈষ্ণব দাস সঙ্কলিত পদকল্পতরুতে তাঁর পদ স্থান লাভ করে। তাঁর রচনা সরল ছন্দোবদ্ধ ও অলংকারের বাহুল্যবর্জিত। জঙ্গীপুরের প্রান্তে সূতী নামক স্থানে তাঁর সমাধি বর্তমান। মেদিনীপুর অঞ্চলে এক দুষ্ট যবন রাজা ছিলেন, তিনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করে আলমগঞ্জে তিনদিন ব্যাপী মহোৎসব করেছিলেন। বৈষ্ণব জগতে তিনি হরবোলা নামে খ্যাত।

শ্রীরমণী মোহন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রবন্ধে (১) সালবেগ, (২) ফটন, (৩) শেখ ভিখান, (৪) শাহ আকবর, (৫) ফকির হবির, (৬) কবির মহম্মদ ও (৭) মেঘলাল নামক মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখ আছে। এই সকল কবিদের কবিতা শ্রী ব্রজসুন্দর সান্যাল কৃত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। মুনসি আবদুল করিম তাঁর রচিত 'সাহিত্য-সংহিতায় এবং 'পূর্ণিমায়' প্রায় কুড়িজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রী দীনেশ সেন তাঁর 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে 'পদ্মাবৎ' প্রণেতা আলোয়াল, আলরাজা, চাঁদ কাজি, গরিব খাঁ প্রমুখের পদাবলী সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বেশ কয়েকজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক শ্রী মাখনলাল রায়চৌধুরী তাঁর 'দিন্-ই-ইলাহি' নামক গ্রন্থে আবদুর রহিম খাঁ নামে এক মুসলমান কবির সংস্কৃত ও হিন্দিতে পদ ও দোহার রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বঙ্গদেশের অনেক মুসলমান ভক্তের রচিত বৈষ্ণবপদ বহু অনুসন্ধানের দ্বারা সংগ্রহ করে শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেছেন যা প্রশংসার দাবি রাখে। উল্লিখিত মুসলমান বৈষ্ণব ও কবিদের রচিত পদাবলীগুলি যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখা যায় যে বৈষ্ণবধর্ম বিশ্বজনীন তা কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কখনোই সীমাবদ্ধ নয়।

**ঋণ স্বীকার :**

১। নিদান কথা—শ্রীমৎ অনির্বাণ।

২। শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান—শ্রীহরিদাস দাস।

৩। বৈষ্ণব মুসলমান, মুসলমান বৈষ্ণব— স্বামী ভূমানন্দ প্রবন্ধাবলী।

৪। সাময়িক পত্র-পত্রিকা সমূহ।

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

নবাঙ্কুর

**মনীষী কথা**

# ‘এদেশের রাজার ছেলে প্রাসাদ ছাড়ে’

ভারতবর্ষের মানুষ অতীব ধার্মিক হয় তা সবাই জানে। পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে সাধারণ মানুষ সবাই ধর্মের পথে চলে। এই ধর্ম কেবল পূজার্চনা নয়; সৎ পথে চলা, সত্যি কথা বলা, মানুষের উপকার করা, এই সবই হলো এদেশের মানুষের কাছে আসল ধর্ম। আমাদের দেশের রাজারাও সব সময় এই ধর্ম পালন করতেন। ধর্ম পালনের জন্য তাঁরা সব রকম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতেন। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এরকমই একজন রাজপুত্র ধর্ম প্রচারের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর নাম গৌতম বুদ্ধ। রাজ ঐশ্বর্য, রাজ সিংহাসন সব কিছু ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন মানুষের মধ্যে ধর্মভাব জাগানোর জন্য।

গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম রাজা শুদ্ধধন। তিনি কপিলাবস্তুর রাজা ছিলেন। বর্তমানে তা নেপালে অবস্থিত। গৌতমের জন্ম হওয়ার পর রাজা শুদ্ধধন আটজন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন পুত্রের নামকরণ করার জন্য। পণ্ডিতগণ শিশুর নাম দেন সিদ্ধার্থ। অর্থাৎ যে সিদ্ধিলাভ করার জন্য জন্মেছে। কিন্তু জন্মের সাতদিন পরেই মা মায়াদেবীর মৃত্যু হলে সিদ্ধার্থ গৌতমী নামে একজন পালিতা মায়ের কাছে মানুষ হন। তাই তাঁর নাম হয় গৌতম। পণ্ডিতগণ গৌতমের নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এই শিশু বড় হয়ে একজন মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী হবে। এই শুনে রাজা শুদ্ধধন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাজার ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয় তাহলে রাজত্ব কে চালাবে? ভাবলেন এ কোনোমতে হতে দেওয়া যাবে না। তখন রাজার ইচ্ছেমতো প্রাসাদের ভিতরেই গৌতম বড় হতে লাগলো। ষোল বছর বয়স হতেই যশোধরা নামে এক কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর গৌতমের এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। নাম রাখা হলো রাহুল। রাজা শুদ্ধধন এবার নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন পরিবারের এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে গিয়ে গৌতম আর সন্ন্যাসী হবে না।

কিন্তু তা হলো না। গৌতমের বয়স যখন ঊনত্রিশ বছর তখন তিনি একদিন নগর ভ্রমণে বেরোলেন। বেরিয়ে তিনি কতগুলি নতুন জিনিস দেখলেন, সেগুলো আগে কখনো দেখেননি। নগরের রাস্তায় কত বৃদ্ধ অসুস্থ লোক জরা ব্যধিতে কষ্ট পাচ্ছে। সারথিকে গৌতম জিজ্ঞেস করলেন— এরা কষ্ট পাচ্ছে কেন? সারথি বলল— মানুষ বৃদ্ধ হলে এরকম কষ্ট পায়। পরপর দু'দিন ব্যাধিগ্রস্ত ও মৃতলোককে দেখে গৌতমের খুব কষ্ট হলো। আর একদিন নগর ভ্রমণ করার সময় তিনি একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন। গৌতম সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন— তিনি কে? সারথি বলল— তিনি সন্ন্যাসী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে গৌতম সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন— তিনিও সন্ন্যাসী হবেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন।

একদিন গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কাউকে না জানিয়ে গৌতম প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সবার মায়া ত্যাগ করে সেই রাতেই তিনি নগর ত্যাগ করলেন। সিদ্ধিলাভ করার পর মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করার ব্রত গ্রহণ করলেন।

## রাজ্য পরিচিতি

# মিজোরাম

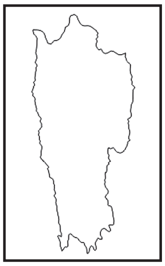

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য মিজোরাম। মিজোরাম কথার অর্থ 'পাহাড়ি জাতির ভূমি'। মিজোরামকে ঘিরে রয়েছে ত্রিপুরা, অসম, মণিপুর রাজ্য এবং দুদিকে রয়েছে দুটি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও মায়ানমার। মিজোরামের ৭২২ কিলোমিটার এলাকা আন্তর্জাতিক সীমানা। মিজোরামের রাজধানী আইজল। এখানকার প্রাচীন ইতিহাস এখনো সেভাবে উদ্ধার করা যায়নি। ভাষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় মিজো ভাষা। মিজোরামের আয়তন ২১ হাজার ৮৭ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ১৪ জন।

## এসো সংস্কৃত শিখি

**भवतु।**
ঠিক আছে।

**आगच्छतु।**
আসুন।

**उपविशतु।**
বসুন।

**सर्वया न।**
সর্বদা নয়।

**किम् अन्यत् ?**
আর কিছু?

## ভালো কথা

# পাখি প্রেমী

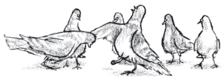

আমি প্রতিদিন সকালে টিউশন পড়তে যাই। বেশি দূরে নয় সেজন্য হেঁটে হেঁটে যাই। যাওয়ার সময় প্রতিদিন দেখি বাজারের মিষ্টির দোকানদার পাখিদের খাওয়াচ্ছেন। তিনি গম, মুড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে খাচ্ছে। তার মধ্যে পায়রা বেশি। তিনি এটা প্রতিদিন করেন। সেই খাবার রাখার জন্য তাঁর একটা কৌটো আছে। সেখান থেকে গম নিয়ে আমিও একদিন পাখিদের খাইয়েছি। নানা রকমের পাখি খেতে আসে সেখানে।

**জয়িতা বর্মন, সপ্তম শ্রেণী, রঘুনাথগঞ্জ।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## ছোটদের কলমে

# শ্রাবণী মেলা

**মেঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম শ্রেণী**

শ্রাবণ মাসে মেলা বসে
মোদের তারকেশ্বরে
বাবা তারকনাথের পুজো হয়
লোকের ঘরে ঘরে।
ভক্তরা সব জল ঢালে
বুড়ো শিবের মাথায়

তারকনাথের আশীর্বাদে
মনের ইচ্ছে পূরণ হয়।
মেলা আমি দেখতে যাই
বাবা মায়ের সাথে
ভোলানাথকে পুজো দিই
শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে।

*এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও*

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

*মেল করা যেতে পারে।*

# স্বামীজীর দৃষ্টিতে মা

**সুতপা বসাক ভড়**

এ সীতা-সাবিত্রীর দেশ। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না।

...ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি, তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে— মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তাহার শেষ। নারী শব্দ উচ্চারণেই হিন্দুর মনে মাতৃভাবের উদয় হয়। ভগবানকে তাহারা মা বলিয়া ডাকে।

...যাহার নিকট হইতে আমরা এই শরীর পাইয়াছি, সেই মহিমাময়ী কী স্বরূপা? কে তিনি, যিনি আমায় দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন? তাঁহার স্থান কোথায়, যিনি প্রয়োজন হইলে আমার জন্য সহস্রবার জীবন দিতে প্রস্তুত? তাঁহার স্থান কোথায়, যাঁহার স্নেহ আমার শত অপরাধ, শত পাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চিরকাল সমধারায় প্রবাহিত?

...মা আমার— তাঁহার আগে যদি আমরা মরি, তবে তাহার কোলেই মাথা রাখিয়া মরিতে চাই। তাঁহার স্থান কোথায়? নারীর নারীত্ব কি শুধু এই রক্তমাংসের শরীরের সহিত জড়িত? দৈহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতে হইবে— এমন আদর্শ চিন্তা করিতেও হিন্দু ভয় পায়। নানা নারী, রক্তমাংসের সহিত সম্বন্ধ এমন বস্তুর সহিত তোমাকে কখনো জড়িত করিতে পারিব না! তোমার নাম চিরকালের মতো পবিত্র হইয়া আছে; কারণ, 'মা' এই একটি শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন্ শব্দ আছে, যাহার সম্মুখীন হইতে কাম সাহস করে না, বা যাহাকে কোনো পশুত্ব স্পর্শ করিতে পারে না? ভারতের হইল ইহাই আদর্শ।

...ভারতের নারীত্বের পরাকাষ্ঠা হইল মাতৃত্বে—সেই অপূর্ব স্বার্থলেশহীনা, সর্বংসহা, ক্ষমা স্বরূপিণী মা-ই আমাদের আদর্শ— স্ত্রী তাঁহার পশ্চাদনুসারিণী ছায়া। মায়ের আদর্শে জীবনগঠনই তাহার একমাত্র কর্তব্য। মা— ভালবাসার আদর্শস্বরূপা, তিনিই পরিবারের কর্ত্রী, পরিবার তাঁহারই। ভারতে পিতাই অন্যায় ও কুকর্মের জন্য প্রহার করেন, মা হন রক্ষয়িত্রী। এই দেশে কিন্তু শাসনের ভার পড়িয়াছে মায়ের উপর, আর পিতাকে হইতে হয় রক্ষাকর্তা— দেখুন আদর্শের তফাত! সমালোচকের দৃষ্টিতে আমি ইহা বলিতেছি না, আপনারা যাহা কিছু করিতেছেন সবই ভাল; কিন্তু যুগযুগান্তর হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাই আমাদের চলিবার ধারা। ভারতে মায়ের মুখে কখনো সন্তানের প্রতি অভিশাপ শুনিবেন না। তিনি কেবল ক্ষমাই করিয়া যান। ভগবানকে আমাদের 'স্বর্গস্থ পিতা' না বলিয়া আমরা সর্বদাই 'মা' বলিয়া থাকি। এই শব্দ ও ভাব হিন্দুর মনে অপার ভালবাসার সহিত জড়িত, কারণ এই মরজগতে মায়ের ভিতরেই আমরা ভগবানের ভালবাসার আভাস সর্বাপেক্ষা অধিক পাই। রামপ্রসাদাদি জগন্মাতার উপাসক সাধকগণের সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা বলিতেছেন, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়।' —ভারতে হিন্দু মায়ের স্থান এইরূপ।

...হিন্দুমতে মা হওয়াই নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য। হিন্দুর এই আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ হইতে কত পৃথক— উভয়ের মধ্যে যেন আকাশ-পাতালের ব্যবধান। আমার জন্মের পূর্বে আমার পিতামাতা সন্তান কামনায় বহু বর্ষ ধরিয়া ব্রত-উপবাস করিয়াছিলেন। কারণ ভারতে সাধারণতঃ সন্তানের জন্মের পূর্বে তাঁহারা ওইরূপ ব্রত-উপবাস করিয়া ভগবানের নিকট সৎপুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। আমাদের স্মৃতিকার ভগবান মনু 'আর্য' সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, ''সৎসন্তান-কামনার ফলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, সে-ই আর্য।'' ভগবানের নিকট সন্তানোদ্দেশ্যে প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহাদের জন্ম হয়, স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনার্য। সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট কামনা করিতে হইবে।

...মাকে কেন এত শ্রদ্ধাভক্তি করিব? কারণ আমাদের শাস্ত্র বলেন, জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যান, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়ুন, আর জগতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশুন, পরিণামে দেখিবেন যে, জন্মগত শুভসংস্কারই আপনার সাফল্যের যথার্থ কারণ। জন্ম হইতে আপনার সদাসৎ অদৃষ্ট নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে— জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব— ইহাই শাস্ত্রের মর্ম। শিক্ষা ও অপরাপর জিনিস সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য।...শাস্ত্রের বিধান— জন্মের প্রাক্কালীন প্রভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

...এই তপস্বিনী আমাকে জগতে আনিয়াছেন, আমি আসিব বলিয়াই বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তিনি দেহ পবিত্র রাখিয়াছিলেন, মন পবিত্র রাখিয়া ছিলেন, অশন-ভূষণ চিন্তা পবিত্র রাখিয়াছিলেন— তাই তো তিনি আমার পূজ্যা।

*১৮.১.১৯০০ ক্যালিফর্নিয়া প্যাসাডেনা সেক্সপিয়র ক্লাবে প্রদত্ত 'ভারতের নারী' ভাষণের অংশ।*

অতিথি কলম

# ভারতের আগামী শতাব্দীর প্রস্তুতি

ড. মুরলীমনোহর যোশী

নীতি আয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশ প্রাসঙ্গিক, সাহসিক এবং প্রশংসাযোগ্য। একে কেউ উপেক্ষা করতে পারবেন না। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আগামী শতাব্দীতে ভারত কীরূপ হবে তার রূপরেখা টেনেছেন। এটা পরিষ্কার যে তিনি নীতি আয়োগের জন্যেও এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছেন। আমার মতে ভারতকে দ্বাবিংশ শতাব্দীর জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাঁর আহ্বান এরকম হবে তা নীতি আয়োগের সদস্যরা কল্পনাও করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী আয়োগের সদস্যদের সতর্ক করেছেন যে, তাঁরা যেন পুরনো ভুল ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের আশা করছেন, যাতে ভারত আগামী শতাব্দীর মুখোমুখি হতে সমর্থ হয়।

আলোচনার বিষয় দেখিয়ে দিচ্ছে যে, নীতি আয়োগকে সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আগামী তিন দশকে ভারতের জিডিপি দুই-অঙ্কে পৌঁছবে। এর ফলে নতুন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ আসবে। ভারতকে তার সম্পদের ব্যবস্থা এভাবে করতে হবে যাতে তা কেবল বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজন পূর্তি না করে, জনসাধারণের মানোন্নয়ন করে তাদের স্ফীত চাহিদাকে জোর গতিতে পরিবর্তিত করে এবং তা যেন যে-কোনো চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে পারে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য জল, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ, শিক্ষা ও শক্তির চাহিদাকে এখন থেকে হিসেব করে তার জন্য ব্যবস্থা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে রোডম্যাপকে সার্থক করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হবে। প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন কৃষি' উৎপাদনে অধিক লাভের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সব হাতে লাভজনক রোজগার দেওয়ার দাবি করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে, আয়োগকে তার সমস্ত যোজনা পূর্ণ করতে পরিবেশের ওপর পড়া প্রভাবকেও মনে রাখতে হবে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নিশ্চিতভাবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০১৬-র গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট নেটওয়ার্ক-এর রিপোর্ট অনুসারে, কেবল সাত মাসের মধ্যেই আমরা সারা বছরের আমাদের ভাগের প্রাকৃতিক সম্পদ খরচ করে ফেলেছি। প্রতি ত্রিশ বছর বা তার বেশি সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তখন ভারতের জনসংখ্যা এমন স্তরে পৌঁছবে যখন অল্প সময়ে এত বৃহৎ সংখ্যার লোকের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এটি এবং অন্য বিষয়গুলি বৈশ্বিক স্তরে আপনা থেকে যুক্ত। নীতি আয়োগের মতো সংস্থাকে এই দৃষ্টিতে খুব গভীরভাবে চিন্তন করতে হয়। এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কোথাও কোথাও তীব্র এবং আগামী ২৫ বছরে ভারতের জনসংখ্যায় ৬৪ বছরের বেশি বয়সের লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার এরকম পরিবর্তন হতে এক শতাব্দীর বেশি সময় লাগে। এছাড়া এই তথ্যের বিষয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন যে, ৬৫ বছরের বেশি আয়ুর লোকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ তার থেকে কম বয়সের লোকের খরচের থেকে ৩.৪ থেকে ৫.৪ গুণ বেশি হয়। আয়োগকে জাপানের বৃদ্ধ সমাজ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সেই ভিত্তিতে নিজেদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। ভারতে জনসংখ্যার নির্ভরতা অনুপাত ১৯৫০-এর ৭.৮ থেকে ২০১০-এ ১১.১ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। নির্ভরতা অনুপাত এক বিশেষ সময়সীমার ওপর এক দেশ, ক্ষেত্র

অথবা ভৌগোলিক খণ্ডে আর্থিকরূপে উৎপাদক প্রতি একশো মানুষের ওপর নির্ভর লোকের গড় সংখ্যা। ভারতের মতো বিকাশশীল দেশের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমার মতে, জনসংখ্যা সংক্রান্ত উন্নয়ন এবং আর্থিক উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়, বিশেষভাবে যখন দুটি অপ্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছে যায়।

বর্ধিত জনসংখ্যা ক্রমশ নিম্ন জীবনযাত্রার মান এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যার এক জটিল জাল নির্মাণ করবে। সুতরাং নীতি আয়োগের যোজনাকর্তাদের এটা আবশ্যিক যে, তাঁদের জনসংখ্যা স্থিরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নকে স্তব্ধ না করে জীবনযাত্রা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা, নির্ভরতা অনুপাত নিম্ন রাখা, আয় বৃদ্ধি ও বৈষম্য দূর করা, শহর ও গ্রামীণ পরিকাঠামোর ব্যবধান দূর করার জন্য এক স্পষ্ট রোডম্যাপ পেশ করা।

নীতি আয়োগের সমীক্ষা রিপোর্ট বর্ধিত জনসংখ্যার রোজগার ও সম্পদ সৃষ্টি, কারিগরী, প্রাকৃতিক সম্পদ, আহার ও পুষ্টি এবং কৃষিতে শূন্য আমদানির ওপর জোর দেয়। এছাড়া আয়োগকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে এবং তাকে সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য আরও বেশি সৌরশক্তির ওপর জোর দিতে হবে। আয়োগকে আগামী একশো বছরের জন্য গ্রামের মানুষ, বনবাসী এবং শহুরে শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তনেরও হিসেব করতে হবে। আমরা যেভাবে জাগতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিকরূপে প্রগতি করবো, সেই অনুসারে নীতি আয়োগকে সামাজিক সৌহার্দ্য মজবুতকারী সামাজিক-আর্থিক কাঠামো খাড়া করার বিষয়েও সচেতন হতে হবে। দূরদর্শী যোজনা ও ব্যবস্থাকে ক্রিয়ান্বয় করার জন্য দক্ষতাপ্রাপ্ত অনুভবী কর্মকর্তা, আবহাওয়াবিদদের এক মজবুত টিম এবং এক পরিসংখ্যান বিভাগের খুবই প্রয়োজন আয়োগের। যেহেতু জি এস টি বিল পাশ হয়ে গেছে, তাই আয়োগকে শিল্প-বাণিজ্য জগতের অনুকূল আর্থিক পদ্ধতি নির্মাণের দিশায় কাজ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের পুনরুত্থান কল্পে অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্তগুলিকেও স্পষ্ট করেছেন। তিনি হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা ভারতীয় পরম্পরা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, জনতার পরামর্শ, বিপরীত চিন্তাধারার লোকেদের অভিমত মনোযোগ সহকারে শোনার আগ্রহ করেছেন। যদি আমরা এরকম করতে পারি তাহলে নীতি ও যোজনাগুলিকে শুধু ব্যর্থ হওয়া থেকে বাঁচানোই যাবে না, বরং ভবিষ্যতের বিপদ থেকে এ আমাদের রক্ষাও করবে। এ সবের অর্থ হলো, ভবিষ্যতের যোজনা ও উন্নয়নের জন্য জরুরি মৌলিক বিষয়গুলি আবার পরিভাষিত করা এবং তাকে নতুনরূপে রচনা করা। এর জন্য ভাবনার এক নতুন দিকের প্রয়োজন। সেটা কী প্রকারের হবে— তা নির্ভর করবে আয়োগের টিমের রূপরেখা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগের টিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'দিগদর্শন' তৈরি করেছেন। এখন নীতি আয়োগের ওপর নির্ভর করেছে যে, তারা আশানুযায়ী আচরণ করে তার ফল প্রদানের জন্য সচেষ্ট হবে।

***(লেখক ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)***


## ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষে চলচ্চিত্র প্রযোজনা

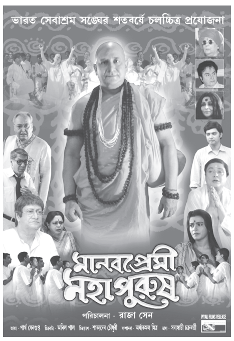


ছবিটি মুক্তি পাবে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬, শুক্রবার। 'প্রিয়া' ছাড়াও আরো ১৪টি হলে।

ছবির পরিচালক রাজা সেন। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন— **অর্জুন চক্রবর্তী। রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ মল্লিক, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, জর্জ বেকার, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ ব্যানার্জী, ডাঃ বি. ডি. মুখার্জী, অনামিকা সাহা, পাপিয়া সেন, মিতা ব্যানার্জী, সোনালী চৌধুরী, মায়া ঘোষ** প্রমুখ। কণ্ঠসঙ্গীতে—হৈমন্তী শুক্লা ও অন্যান্যরা। ভাষ্যে—সব্যসাচী চক্রবর্তী।

ছবিতে দেখা যাবে একজন সাধারণ মানুষের নির্লিপ্তভাবে মানুষের সেবাকার্যে জীবনকে নিয়োজিত করে সেবাকেই তপস্যা ভেবে অনন্য সাধারণ মানবে পরিণত হওয়া। কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকে কী কঠিন কঠোর সংগ্রাম করে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া। যৌবনে কঠিন তপস্যা-আরাধনা, বিশাল সন্ন্যাসী সংগঠন, বিপ্লবীদের জীবন গঠনে সাহায্য, আর্ত-পীড়িত-দুর্বল মানুষের সেবাতে আত্মত্যাগ, অস্পৃশ্যতাকে বিদূরিত করার জন্য তাঁর অনন্য সাধারণ প্রয়াস, তমসাচ্ছন্ন ধর্মীয় সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করার চেষ্টা, তাঁর এইসব কর্মপন্থায় একদিন তাঁকে মহাপুরুষে পরিণত করেছে, কী ভাবে?

কিভাবে তিনি অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষ হলেন? অনাবিষ্কৃত নানা প্রামাণিক তথ্যে ছবিটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পুরো ছবিতেই একটা নতুনত্ব রয়েছে। অবশ্যই দেখুন। **যোগাযোগ : ৯২৩১৮৭৮১১১।**



জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

# স্বস্তিকা

***পড়ুন ও পড়ান***

**প্রতি কপি ১০্ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা**

# বিজেপি-র অসম বিজয়ের অভিঘাতেই পাল্টাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জী?

সাধন কুমার পাল

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার পর থেকে মমতা ব্যানার্জীর চলন বলন থেকে পাড়ার ঝগড়াটে মহিলার ইমেজটা যেন উধাও। ব্যক্তিত্বের এই পরিবর্তন এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে মমতা ব্যানার্জীর সরব হওয়ার বিষয়টিও রাজ্যবাসীর কাছে বেশ একটা নতুনত্ব। নতুনত্ব ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেও। এবার আক্রমণের নিশানা পাল্টে কামান দেগেছেন মূলত বিজেপির দিকে। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের পর ভারতীয় জনতা পার্টি যখন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেহাল সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরব তখন মমতা ব্যানার্জী সীমান্ত সুরক্ষা, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি। বরং এই কাণ্ডের মধ্যে 'র' এর হাত অর্থাৎ কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র দেখতে পেয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে কথা বলার জন্য সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে পুরতে চেয়েছিলেন। অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করেছিলেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত মানে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। সীমান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সিংহ ভাগই মুসলমান। সুতরাং মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে আঁচড় লাগার ভয়ে মমতা ব্যানার্জী সীমান্ত নিয়ে মুখ খুলবেন না, প্রয়োজনে খাগড়াগড় কাণ্ডের মতো অপরাধীদের আড়াল করার প্রয়াস চালাবেন--- চলমান 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনীতির ধারা অনুসারে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসেই সীমান্ত এলাকায় অপরাধ দমনে কড়া হাতে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৪ জুন শুক্রবার কলকাতার টাউন হলে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান এবং অন্যান্য অপরাধ বন্ধে সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেন।

**আগামীদিনে সমীহ করার মতো বিরোধী দল হিসেবে মমতার সামনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ ভারতীয় জনতা পার্টি। ইসলামিক আগ্রাসন, অনুপ্রবেশ, গোরু পাচার, সীমান্ত সমস্যা বিজেপির এই সমস্ত ইস্যুর ভিত্তিতে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার ভোটারদের মধ্যে অসমের মতো মেরুকরণ অবশ্যম্ভাবী।**

শোনা যাচ্ছে, বৈঠকে নাকি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চোরাচালান নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মালদার পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সীমান্ত চোরাচালান বন্ধের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় আফিম চাষ বন্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হতে চললেও বাস্তবে সীমান্ত এলাকার প্রতিদিনের পরিচিত চিত্রের কোনো পরিবর্তন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জীর আচরণে এই ধরনের পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কেন?

মমতা ব্যানার্জীর এই পরিবর্তিত আচরণের নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। অনেকেই হয়তো বলবেন বাংলাদেশে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের বাড়বাড়ন্তই দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতাকে সীমান্ত নিয়ে সচেতন করেছে। যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যাচাই করলে দেখা যাবে এই ধরনের ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং সীমান্ত নিয়ে মুখ খোলার পিছনেও রয়েছে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক হিসেব। কারণ, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নতুন করে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে এমন নয়। এই সীমান্ত বরাবরই ভারতের অতি সংবেদনশীল সীমান্ত বলেই পরিচিত। আসলে কিছু ব্যতিক্রম বাদে ভারতের মতো দুর্ভাগা দেশের রাজনীতিকরা এমনই যে, কোনো সমস্যা তা যত গুরুতর হোক না কেন, সরাসরি ভোটের ফয়দা না হলে কিংবা ভোটের বাক্সে বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকলে সেটি নিয়ে মুখ

খোলেন না। যেমন সীমান্ত সমস্যার মতো গুরুতর সমস্যা নিয়ে একমাত্র বিজেপি ছাড়া আর কোনো দলকে মুখ খুলতে দেখা যায় না। তবে অন্য কোনো দল মুখ খুললেও দেখা যাবে সীমান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নিজেদের দলীয় কর্মীদের বাঁচাতে কিংবা সীমান্ত এলাকায় নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে বিএসএফের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। দেশে ভারতীয় জনতা পার্টিই বোধহয় একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা কিনা সীমান্তে অপরাধ, অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, গোরুপাচার, জাল নোট, আফিম চাষের মতো ইস্যুগুলিকে বারোমাস্যা বানিয়ে ফেলেছে। ফলে মানুষের কাছে এই সমস্যাগুলি সবই ভারতীয় জনতা পার্টির ইস্যু বলেই পরিচিত।

বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের অভিমুখ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হবে যে আগামীদিনে সমীহ করার মতো বিরোধী দল হিসেবে মমতার সামনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ ভারতীয় জনতা পার্টি। ইসলামিক আগ্রাসন, অনুপ্রবেশ, গোরু পাচার, সীমান্ত সমস্যা বিজেপির এই সমস্ত ইস্যুর ভিত্তিতে আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার ভোটারদের মধ্যে অসমের মতো মেরুকরণ অবশ্যম্ভাবী। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি বলে দিচ্ছে সামান্য মাত্রায় হলেও এ রাজ্যে এই ধরনের মেরুকরণ হতে শুরু করেছে এবং মমতার মুসলমান তোষণ নীতি আগামীদিনে এই মেরুকরণকে ঝড়ের আকার দেবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এ ব্যাপারে এক মত যে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের স্লোগান ও ইসলামিক আগ্রাসনের আতঙ্কজাত মেরুকরণই ৩৪.২২ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাজ্য অসমে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। সংখ্যালঘুর নামে মাত্রা ছাড়া মুসলমান তোষণ করেও অসমে কংগ্রেস ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি।

এ আই ইউ ডি এফ-এর মতো ইসলামিক দলকেও অসমের ভোটাররা কোণঠাসা করে দিয়েছে। অসমের ফলাফল বলে দিচ্ছে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ মুসলমান হলেও শুধুমাত্র মুসলমান তোষণ করে এখানে ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব নয়।

হতে পারে অভিজ্ঞ রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসম থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের রাজনৈতিক কৌশল পাল্টাচ্ছেন। সেজন্যই প্রথমবার ক্ষমতায় এসে ইমাম ভাতা, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রবৃত্তি প্রদান, হজ হাউস নির্মাণ, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মাদ্রাসারগুলির স্বীকৃতি প্রদানের মতো নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে লাগাম ছাড়া মুসলমান তোষণ নীতি গ্রহণ করলেও দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই দরিদ্র হিন্দুদের দাহ করার জন্য দুই হাজার টাকা অনুদান, শ্মশান সংস্কারের মতো হিন্দু স্বার্থে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। যদিও জীবিকামুখী বা ধর্মসংরক্ষণমুখী কর্মসূচির বদলে হিন্দুদের জন্য মমতা ব্যানার্জীর এই শ্মশানমুখী কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেককেই নানা প্রশ্ন তুলতে শোনা যাচ্ছে। 'হিন্দুস্বার্থ' ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সীমান্ত অপরাধ, অনুপ্রবেশের মতো 'নরম হিন্দুত্ব ইস্যু'গুলি নিয়েও ইতিমধ্যেই নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি বন্ধ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রকাশ্য হুমকি মানুষ শুনতে অভ্যস্ত। কলকাতার এক তোলাবাজ কাউন্সিলারকে জেলে পোরার দৃশ্যও মানুষ দেখছে। যদিও শোনা যাচ্ছে এই কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুরোধই নাকি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই সমস্ত অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই কতটা সিরিয়াস তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ এত হুমকি সত্ত্বেও যেমন সিন্ডিকেট রাজ ও তোলাবাজির পরিচিত দৃশ্যের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি, ঠিক তেমনি মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা সত্ত্বেও বাস্তবে সীমান্ত অপরাধ বন্ধ হওয়া বা কমে আসার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।

এই সমস্ত অপরাধ দমনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কারণ একটু খোঁজ খবর করলে দেখা যাবে সীমান্তে জালনোট পাচার, গোরুপাচার, মাদক পাচার, চোরা কারবার, অবৈধ অনুপ্রবেশ, নাশকতার উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজীর মতো অপরাধ কোনো ছিচকে চুরির ঘটনা নয়। এগুলি সবই আসলে বৃহত্তর অপরাধ চক্রের অঙ্গ। যে অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা প্রশাসন ও রাজনীতির উঁচু তলার কেষ্ট বিষ্টুদের। সীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের দ্বারা।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের হাত নাকি প্রশাসন ও রাজনীতির উঁচু তলা ছাড়িয়ে বিচার বিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্রাম শহর সর্বত্র এই অপরাধ চক্রই নির্বাচনের সময় কোনো দলকে জেতানোর ব্যাপারে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। সেজন্য লোক দেখানো প্রশাসনিক তৎপরতায় এই সমস্ত অপরাধ বন্ধ করা যাবে না। এই সমস্ত অপরাধ চক্র ভাঙতে গেলে বড় ধরনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক তৎপরতাও চাই।

পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলি হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। তথ্য বলছে সীমান্তের অপরাধের যুক্তরা সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সীমান্তে বেশি কড়াকড়ি করা মানে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে টান পড়া। সীমান্ত এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাবে গোরু পাচারকারীদের বৈধ কাগজপত্র তৈরি করে দেওয়া, অপরাধীদের পুলিশ, বিএসএফের কাছ থেকে আড়াল করার মতো ক্রিয়াকলাপ সীমান্ত এলাকার ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রতিনিধি ও দলীয় ফান্ড সংগ্রহকারীদের কাছে হিরের খনি। সেজন্য লোক দেখানো হুমকিতে সাতে পাঁচে না যাওয়া মানুষের কাছে ভাবমূর্তি তৈরি করে ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করা যেতে পারে, বিজেপির পাল থেকে হওয়া কেড়ে নেওয়ার রাজনীতি করা যেতে পারে কিন্তু এই সমস্ত অপরাধ বন্ধ করা যাবে না। ■

# বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অবদান ও সনাতন ধর্ম

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড. আলোক কুমার প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে গবেষণা করেছেন। জন্মসূত্রে ভারতীয় এই অধ্যাপক 'Sciences of the Ancient Hindus : Unlocking Nature in the Pursuit of Salvation' নামে একটি গ্রন্থরচনা করেন তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রকাশনা সংস্থা তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি ছিল যে হিন্দু বিজ্ঞানের ইতিহাস জানার ব্যাপারে এই গ্রন্থটির প্রস্তাব প্রণিধানযোগ্য কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে। তার কারণ এই হিন্দু বিশেষণটি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং এই শব্দটির সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি জড়িত। কেবল এরাই নয়, আরও বেশ কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা লেখককে অনুরোধ করেন, 'হিন্দু' শব্দের বদলে 'ইন্ডিয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হোক। 'হিন্দু' শব্দটিতে তাদের আপত্তি আছে। লেখক রাজি হননি, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের খরচে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক কুমার কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নন, এই গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্যও তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। একজন বিজ্ঞানসাধক হিসাবে তিনি বরাবরই বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাই তিনি 'হিন্দু' শব্দটাই রেখে দেওয়া মনস্থ করলেন। কারণ বেদ ও উপনিষদ যাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন তাঁরা এই নামেই পরিচিত ছিলেন সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহে। 'ইন্ডিয়া' শব্দটি গত ২৫০ বৎসর যাবৎ জনপ্রিয় হয়েছে যে সময়কালটি লেখকের গ্রন্থটির সময়কালের পরবর্তী পর্যায়।

অধ্যাপক কুমারের পিতামাতা তাঁকে হিন্দু সংস্কৃতির দীর্ঘমেয়াদি ও উজ্জ্বল বৌদ্ধিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যেরই বিষয়ে বিশদে জানার জন্য তিনি উদ্যোগী হন এবং উপলব্ধি করেন যে প্রাচীন পৃথিবীর হিন্দু ভাষ্য পাশ্চাত্যের উপেক্ষাই পেয়ে এসেছে, অথবা তাদের দৃষ্টিতে 'একদেশদর্শী', 'অতিরঞ্জিত' অথবা 'ভুল' বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রায় ২৫০ বছর যাবৎ পাশ্চাত্যের অবস্থান এই ব্যাপারে অন্তত একই ছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে বৃটিশ ভারতের যুগ পর্যন্ত যে সময়টা পাওয়া যায়, সেই সময়ের হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস পাশ্চাত্যের ক'জন জানেন? শুধু পাশ্চাত্যের কথাই বা বলি কেন, এ দেশের মানুষই বা ক'জন জানেন বা জানবার চেষ্টা করেন? অধ্যাপক কুমার মনস্থ করেছিলেন যে অতীতের গ্রিক, মধ্যপ্রাচ্যের মিশরীয় এবং ইউরোপীয়ান তথ্যাবলী ঘেঁটে প্রাচীন হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে কী আছে খুঁজে বের করবেন।

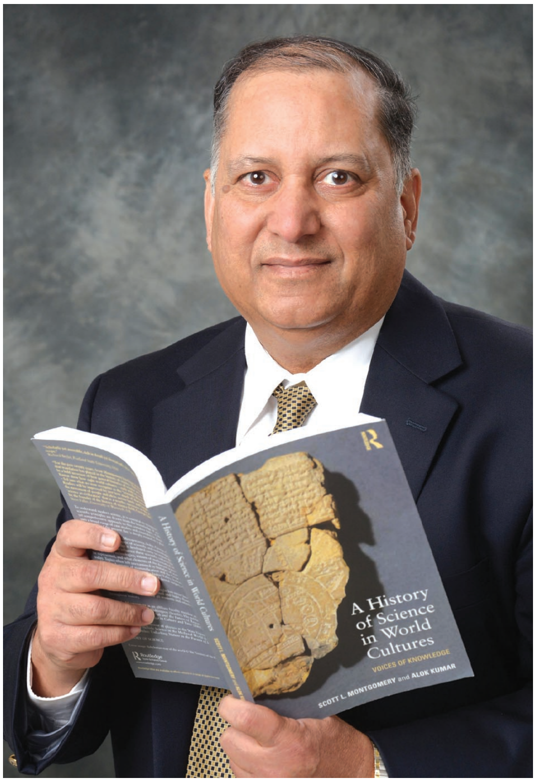


ড. আলোক কুমার

তিনি কাজ শুরু করে দেন। গ্রিক ইতিহাস ঘেঁটে তিনি অ্যারিস্টটল, আরিয়ান, মেগাস্থিনিস, ক্লেমেন্ট অব আলেক্সান্ড্রিয়া ও টায়ানসের অ্যাপোলোনিয়াসদের লিখিত বিবৃতি থেকে হিন্দুদের বিজ্ঞানে অগ্রগতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। এখানেই থামেননি তিনি, মুসলমান গবেষক আল-বেরুনি, আল-খোয়ারিজমি, ইবন লাব্বান, আল-ফাজারি, আল-মাসুদি ও আল-উকলিদিসিদের লেখা থেকে, চীনদেশের ফা-হিয়েন, হিয়েন সাং ও ওয়াইজিংদের লেখা থেকে, ইউরোপের লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি, পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার, রজার বেকন, ভলটেয়ার এবং কোপারনিকাসের লেখা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন।

এই সমস্ত সংগৃহীত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র উপস্থাপিত করেছে। এমনকী এই আধুনিক যুগেও চিন্তাবিদ ও বৈজ্ঞনিকদের মধ্যে অনেকেই যেমন গ্যেটে, এমার্সন, থোরো, য়ুং, ওপেনহাইমার, হার্ডার ও শ্রোডিংগার প্রমুখ বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায় এবং দর্শন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাচীন হিন্দুদের অবদানের কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে তাঁরা যে হিন্দুদের কাছে ঋণী, তাও স্বীকার করেছেন নিঃসঙ্কোচে। এ থেকে যে সত্যটা বেরিয়ে আসে তা জনপ্রিয় মিডিয়ার, এমনকী বহু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রচারিত ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাচীনকালের হিন্দুর

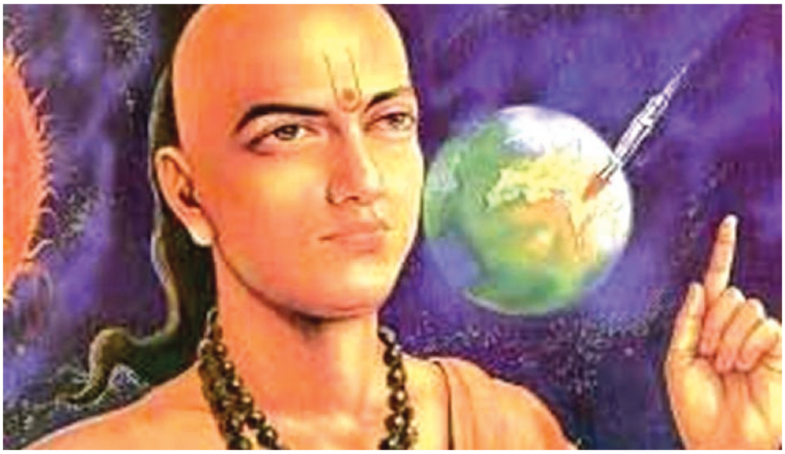

আর্যভট্ট

অবদান না থাকলে মানব সমাজ আজও আদিম অবস্থায় পড়ে থাকত। প্রাত্যহিক জীবনে যা কিছু অপরিহার্য, যেমন এক থেকে দশ এই সংখ্যাব্যবস্থা এবং শূন্যের ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক বিষয় হিসাবে তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেন। আয়ুর্বেদ নামক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁরাই উদ্ভাবন করেন। শরীর এবং মন যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত, তা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেরই অবদান। মানুষের শরীরের খুঁটিনাটি, শল্যজ্ঞান, চোখের ছানি অপসারণ, এমনকী প্লাস্টিক সার্জারি পর্যন্ত সেই সময় হিন্দুদের করায়ত্ত ছিল। ধাতুর উত্তোলন ও দূষণমুক্তির জন্য মেটালার্জিকাল কলাকৌশল তাঁরাই আবিষ্কার করেন। তথাকথিত দামাস্কাস ব্লেডও তাঁদেরই অবদান। মহাকাশ গবেষণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলী পৃথিবীর গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা সুনিশ্চিত করেছিল। তাঁদের প্রতিটি আবিষ্কারই বিজ্ঞানসম্মত এবং বিস্ময়কর। পৃথিবীবিখ্যাত যোগব্যায়াম প্রাচীন ভারতের হিন্দুর অবদান।

মেধাবী মানুষজনের বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা যে-কোনো পরিস্থিতিতেই প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু বৌদ্ধিক উৎকর্ষের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিছুটা অনুকূল হওয়া আবশ্যক। ভারতের বিশাল খনিজ সম্পদ, নানা প্রজাতির পশুপাখি ও বৃক্ষরাজি, অনুকূল আবহাওয়া এবং সর্বোপরি দৃঢ় সামাজিক নীতিবোধ ভারতকে যে বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক সুস্থিতি দিয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে হিন্দুজাতির উৎকর্ষ এবং বৌদ্ধিক বিকাশ।

বিখ্যাত আমেরিকার দার্শনিক ও কবি র‍্যাস্ফ ওয়ালডো এমারসন (১৮০৩-১৮৮২ খৃস্টাব্দ) এই ব্যাপারটা স্বীকার করে লিখেছেন যে জলবায়ুর আনুকূল্য যেটা জীবনধারণ সহজ করে দেয়, গৃহের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের জীবনকে টেনে আনে, তা প্রাচ্যের জাতিগুলিকে এক উচ্চতর বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিয়েছিল যা বর্তমানে দেখা যায় না। এরই উদাহরণ হিন্দুজাতির অসাধারণ প্রতিভা যা আজও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এটা এমারসনের কথা, আমার নয়।

মেগাস্থিনিস (৩৫০-২৯০ বি. সি.) ছিলেন প্রথম সেলুকাসের রাষ্ট্রদূত, তিনি সিন্ধু-সরস্বতী অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে এখানে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আর এখানকার মানুষদের আলাদা করে চেনা যায় তাদের গর্বিত ভঙ্গি দেখে। তাছাড়া এরা নানা ধরনের শিল্পে পারদর্শী যেটা দূষণমুক্ত বাতাস এবং সুস্বাদু পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রভাব বলা যায়। ওয়াইজিং (৬৪৩-৭১৩ খৃ:) একই ধরনের পর্যবেক্ষণ করেছেন হিন্দুদের উন্নত জীবনযাত্রা দেখে। তিনি লিখেছেন— ‘‘ঘি, তেল, দুধ ও মাখন সর্বত্র পাওয়া যায়। কেক ও ফল এত বেশি রকমের পাওয়া যায় যে তার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।’’

সৈয়দ আল-আন্দালুসি (১০২৯-১০৭০ খৃ:) মুসলমান এবং স্পেনের দার্শনিক। তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম ‘তাবাকত আল উমাম।’ এই গ্রন্থে তিনি বিজ্ঞানে যে সব দেশ বিশেষ অবদান রেখেছিল, সেই সব দেশকে চিহ্নিত করেন এবং ভারতবর্ষের প্রভূত প্রশংসা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সে দেশের অনন্যসাধারণ ভূমিকার জন্য। তিনি লিখেছেন যে, যে দেশটি সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সাধনায় উৎকর্ষ অর্জন করে, সেই দেশটির নাম ভারত। ভারত তার অধিবাসীদের জ্ঞান ও মেধার জন্য খ্যাত। বহু শতাব্দী যাবৎ অতীতের রাজন্যবর্গ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ভারতের জনগণের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মধ্যযুগের ইউরোপে এই গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯১ সালে ড. কুমারই সর্বপ্রথম সৈয়দ আল-আন্দালুসির গ্রন্থটি ইংরাজিভাষী পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেন ‘Science in the Medieval World’ গ্রন্থের মাধ্যমে।

হিন্দুদের মধ্যে তর্কযুদ্ধের রীতি প্রচলিত ছিল এবং এই বিষয়টিকে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হোত। চরক সংহিতায় শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে তর্ক ও আলোচনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখার শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা, তর্কবিতর্ক করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, চিন্তাশক্তির খর্বতা দূর হয়। চরক সংহিতা যা মূলত চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য তর্কবিতর্কের ব্যাপারে এই সংহিতা কিছু নিয়মাবলী সংযোজিত করে। চরক সংহিতা বলেছে যে বিজয়ীর জন্য উৎসব করা পরিহার করা উচিত এবং পরাজিতের উদ্দেশে কোনো প্রকার অশোভন উক্তি বা অপমানজনক মন্তব্য করা অনুচিত। এই সব শাস্ত্রার্থের (বিতর্ক) বিশদ নিয়মাবলী পাশ্চাত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীর Robert's Rules of Order-এর পূর্বসূরী, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রাচীন হিন্দু তাঁদের সাহিত্যকর্ম অবিকল ধরে রাখতে পারতেন স্মৃতিতে। তাঁদের মুখনিঃসৃত কথা, লিখিত বিবৃতি নয়, ছিল তাঁদের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের ভিত্তি। যাঁরা শাস্ত্রসমূহ স্মরণে রাখতে পারতেন বেশিরভাগই ছন্দোময় প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো, উচ্চারণ করতেন

অবলীলায়, তাঁরা সমাজে শ্রদ্ধার আসন পেতেন। বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও চতুর্বেদী তাঁদেরই বলা হোত যাঁরা ওই সংখ্যক বেদে পারদর্শিতা অর্জন করতেন। ওয়াইজিং লিখেছেন— "বেদ সমূহ মুখে মুখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়ে এসেছে— কাগজে বা কোনো পাতায় রূপ পায়নি। প্রত্যেক প্রজন্মে কিছু মেধাবী ব্রাহ্মণ ছিলেন যাঁরা এক লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করতে পারতেন। এই কথাগুলি কল্পিত নয়, কারণ আমি নিজে এই রকমের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।"

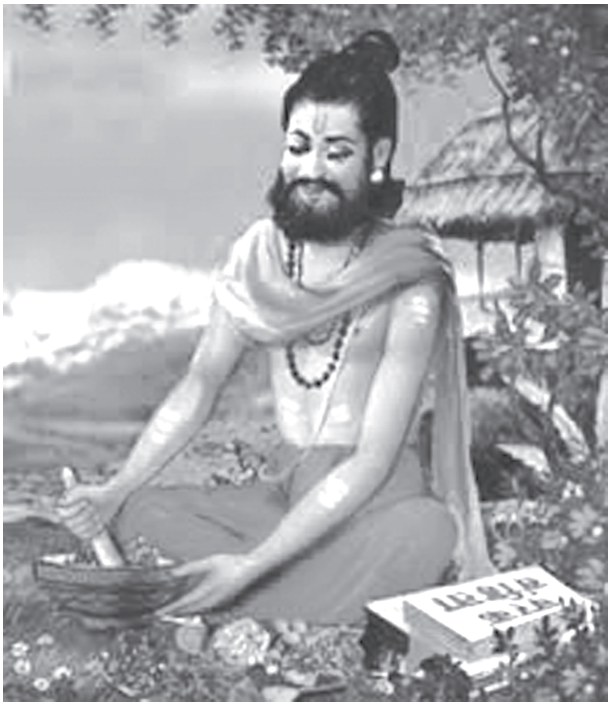
চরক

আলবেরুনি বিখ্যাত ইসলামিক গবেষক, একাদশ শতাব্দীতে ভারতে তেরো বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য হিন্দুরা কাব্যসাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে হিন্দুরা দীর্ঘ কবিতার স্টাইলে লিখতে পছন্দ করেন যাতে মানুষ সেসব মুখস্থ করতে পারে এবং লিখিত গদ্যের দিকে না গিয়ে বিজ্ঞানসংক্রান্ত সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে মনে রাখতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে মানুষের মন যে কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। একই সঙ্গে তাঁরা যেখানে শৃঙ্খলা নেই, সেখানে বীতশ্রদ্ধ। আলবেরুনির মতে হিন্দুরা গদ্যের থেকে পদ্যরচনা বেশি পছন্দ করেন, কারণ সেখানে আছে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ছন্দ।

প্রাচীন হিন্দুর বিজ্ঞানসাধনা ছিল তাঁদের ধর্মেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, যোগাভ্যাস এবং চিকিৎসাশাস্ত্র— এই সকল বিষয়ের চর্চা হোত ধর্মের প্রয়োজনে এবং স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার কারণে। হিন্দু বিদ্বজ্জন কখনই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধিতা খুঁজে পাননি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, জোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও শিল্পকলা সর্বোচ্চ সত্য জানবার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জোতির্বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, গণিত এবং ইতিহাস মোক্ষলাভের জন্য জরুরি। এই যে একটা বৌদ্ধিক পরিবেশ যেখানে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হোত, সেটিই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

মহান জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (৪৭৬-৫৫০ খৃ:) তাঁর গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে সূর্য স্থির থাকে, পৃথিবী ঘোরে। পৃথিবী থেকে আমরা যেমন দেখি সূর্য পূর্বদিকে উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম দিকে, এই ব্যাপারটা তিনি নদীতে দাঁড় বেয়ে যাওয়া একটি নৌকোর উদাহরণ দিয়ে বোঝান। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে নৌকোর আরোহী যখন সামনের দিকে তরতর করে এগিয়ে যায়, তখন সে দু'পাশের স্থির বস্তুগুলিকে মনে করে পিছনে সরে সরে যাচ্ছে। সূর্য স্থির, পৃথিবীই গতিশীল। প্রায় হাজার বছর পরে কোপারনিকাস পৃথিবীর গতিশীলতা বোঝাতে একই ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন।

সংস্কৃত শব্দ যোগঃ'র অর্থ একত্রীকরণ অথবা যোগদান। কেউ মনে করে যোগ মানে আমাদের শরীরের সঙ্গে মনের সংযোগ, আবার কেউ কেউ মনে করে যোগের অর্থ ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগ। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি দৈনন্দিন জৈবিক অস্তিত্ব

ছাড়িয়ে তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে মোক্ষলাভের দিকে অর্থাৎ সকল হিন্দুর যেটা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য, সেই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ করার চেষ্টা করে। যোগাভ্যাস মানুষের শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সব থেকে প্রাচীন পন্থা। যোগ প্রাচীন হিন্দুদের এক চমকপ্রদ অবদান। তাঁরা নানা ধরনের ছোট-বড় প্রাণী, তাদের জীবনধারা, তারা কীভাবে নিজেদের অসুখ সারায়, কীভাবে তারা অসুখ-বিসুখ এড়াবার চেষ্টা করে, এ সবই পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁদের এই পর্যবেক্ষণ থেকে গাছপালাও বাদ যেত না। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে একটি চিকিৎসা ব্যবস্থাও নেয়, যার নাম আয়ুর্বেদশাস্ত্র।

ড. কুমার জানিয়েছেন যে সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের ছাত্রসমাজকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়, তার কাছাকাছি হিন্দু সভ্যতাকে তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, কারণ পাশ্চাত্যের শিক্ষাজগতে প্রাচীন হিন্দুর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। বিজ্ঞানে হিন্দুদের অবদান সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের বহু মানুষ এখনও অজ্ঞ। আমরা মনে করি ড. কুমারের গবেষণা দেশপ্রেমী ভারতীয়দের এই বিষয়ে আরও চর্চার জন্য অনুপ্রেরণা

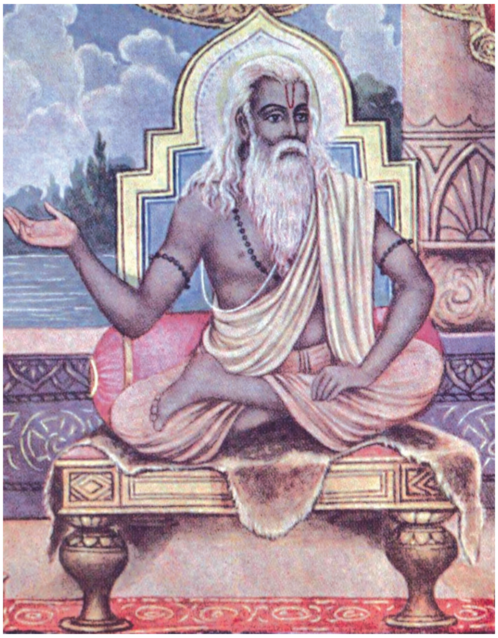

ব্যাসদেব

জোগাবে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের সবার। 'হিন্দু' শব্দ সম্বন্ধে যাদের অ্যালার্জি আছে, অথবা ভুল ধারণা আছে, তাদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে, এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না। ইদানীং 'হিন্দুত্ব' 'হিন্দুত্ববাদ' ইত্যাদি শব্দগুলি মিডিয়ার দ্বারা, রাজনৈতিক দল সমূহের দ্বারা খুব বেশি রকম ভাবে প্রচারিত হচ্ছে। কিছু সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতির লোকজন মনে করে, যেমন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, তেমনই একটি মতবাদ হলো হিন্দুত্ববাদ। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবের কথা যে বলবে, তাকেই বলা হবে হিন্দুত্ববাদী এবং সাম্প্রদায়িক। এরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এদের কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা, আচার ব্যবহার সবই ধর্মসর্বস্ব। ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋক্‌বেদ এরা মনে হয় পড়েনি। বেদ, উপনিষদ ভারতের নিজস্ব সম্পদ কিন্তু সংস্কৃত ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে ব্রাত্য করে রেখে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাচীন ভারতের অমূল্য বৌদ্ধিক সম্পদগুলি সাধারণের আওতার বাইরেই থেকে গেছে। সংস্কৃত ভাষার পুনর্জাগরণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন দরকার।

প্রাচীন ভারতের মানুষ প্রকৃতি পূজারি ছিলেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় মানুষের কাছে প্রকৃতিই ছিল দেবতা যে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সে কারণেই প্রকৃতিকে পূজা নিবেদন করে তারা প্রকৃতির কাছে তাদের ঋণ স্বীকার করতো। তাঁরা মনে করতো যা সত্য, তাই ধর্ম। মানুষকে মানবধর্ম পালন করতে হবে, ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুর দর্শনে প্রকৃতির সকল অবদানের মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান। সুতরাং সকলের মঙ্গলই কাম্য, এখানে স্বধর্মী ও বিধর্মীর কনসেপ্ট অনুপস্থিত। হিন্দু ধর্ম কোনো প্রফেট প্রচারিত ধর্ম নয়; এটি একটি সুপ্রচীন, উন্নত জীবন শৈলীর ধারাবাহিকতা, যে ঐতিহ্য আমরা আজও বহন করে চলেছি। হিন্দু দর্শন বলেছে— 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'— সবাই সুখে থাকুক সকলের নিরাময় হোক'— এটাই ভারতের সনাতন ধর্ম, যা শাশ্বত, যার ক্ষয় নেই। হিন্দু দর্শনকে 'রিলিজিয়ন' বলা ভুল, হিন্দুধর্ম কোনো রিলিজিয়ন নয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''ইউরোপে রিলিজিয়ন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব।'' খৃস্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম সবই 'রিলিজিয়ন', কিন্তু ভারতের আদি ধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' নামেই অভিহিত করা সঙ্গত, যা কিনা জগতের মঙ্গলের ধর্ম। বেদে 'ধর্ম' শব্দটি পাওয়া যায়, 'হিন্দু' শব্দ অনুপস্থিত।

যখন আমি মনে করি যে সাত হাজার বছরের পুরনো জ্ঞানবিজ্ঞানে এক অতি উন্নত মহান এবং সকলের কল্যাণকামী এক সভ্যতার আমি উত্তরাধিকারী, তখন নিজেকে হিন্দু বলতে গর্ববোধ করি। ভারতীয়ত্ব থেকে হিন্দুত্বকে আলাদা করা যায় না, হিন্দুত্ব কোনো রিলিজিয়ন নয়, হিন্দুত্ব একটি বিশেষ জীবনশৈলী যার মূলে আছে ভারতীয় দর্শন। এই প্রসঙ্গে বলি, আজকের পৃথিবী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের তাণ্ডবে অস্থির, শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলি পৃথিবীর নানা দেশে যখন তখন ধর্মের নামে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, যে ধর্মে আধ্যাত্মিকতার কোনো জায়গা নেই। এখানেই ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্বের জয়, যে ধর্ম আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করে, মানবিকতার উপর ভিত্তি করে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আজ শুধু কৃষ্ণনাম করার জন্য, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামে সঙ্কীর্তনে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবার জন্য বিদেশ থেকে অসংখ্য নারীপুরুষ মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে ছুটে আসছেন, সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদন করছেন। হলিউডের বিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী জুলিয়া রবার্টস্ হিন্দু তথা ভারতীয় দর্শন নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করেন যার থেকে তিনি এক নতুন আলোর সন্ধান পান, ছুটে আসেন ভারতে সপরিবারে। হরিয়ানার এক মন্দিরে ২০১০ সালে নবরাত্রির সময় তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এই খবরগুলি এদেশের মিডিয়ায় গুরুত্ব পায় না। কিন্তু 'ঘরবাপসি' হলে মিডিয়া ও ফেক বুদ্ধিজীবীর দল মড়াকান্না শুরু করে দেয়। হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরকরণ নেই, কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্মে আসতে চায়, তাকে গ্রহণ করা হয় যেমন জুলিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে ১১৮টি দেশ খৃস্টধর্মীয়দের দখলে পঞ্চাশটি দেশের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে যেখানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। অথচ সারা পৃথিবীতে একটিও হিন্দুরাষ্ট্র নেই, একটিও দেশ নেই যেখানে রাষ্ট্রধর্ম হিন্দুত্ব। হিন্দু দর্শনে সাম্রাজ্যবাদের স্থান নেই। ধর্মান্তরিত হও, রাজি না থাকলে এদেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাও, নতুবা মরো— এই নীতি হিন্দুর নয়, বলপ্রয়োগের সাহায্যে অথবা ছলে বলে কৌশলে অন্যের জমি দখল করে সেখানে গেড়ে বসা, ভারতীয়ত্ব নয়। একমাত্র হিন্দুরাই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে, সেমিটিক ধর্মগুলির কাছে যা একান্তই অবাস্তব এবং অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''এক সময় ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল''। এর মূলে ছিল মেধাবী ভারতের বিজ্ঞান সাধনা, শিল্পসৌকর্য ও আধ্যাত্মিকতা। বর্তমান ভারতের জনগণকে যদি এই বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন করা যায়, তাহলে অচিরেই অতীতের গুরুর আসনটি ভারত আবার লাভ করবে, এই আমাদের আশা।

*(লেখিকা যোগমায়া কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)*

# এলাচের উপকারিতা

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

এলাচের দুটি ভাগ আছে। বড় এলাচ ও ছোট এলাচ। দুটির কাজের ধারা দু'রকম।

কোনও কোনও চিকিৎসকের মতে, বড় এলাচের ক্বাথ কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাকস্থলীর উত্তেজনা কমায়, দাঁতের গোড়া ও মুখের নানা রোগে এই ক্বাথ ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

- ২ গ্রাম যে কোনও আকৃতির এলাচ-চূর্ণ আন্দাজ মতো কুইনাইনের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে স্নায়ুরোগে উপকার দেয়।
- বড় এলাচ দিয়ে তৈরি তেল ওষুধ তৈরিতেও কাজে লাগে।
- পেট গুম্ মেরে রয়েছে? ঘনঘন ঢেঁকুর উঠছে? প্রস্রাব ঠিকমতো হচ্ছে না? অত শত না ভেবে খোসা সমেত দুটি বড় এলাচ চন্দনের মতো করে বেটে এক কাপ জলে গুলে ছেঁকে রোজ সকালের দিকে খালি পেটে একবার খেয়ে নেবেন। সমস্যা মিটবে। হজমশক্তি বাড়াবে। কোষ্ঠকাঠিন্য কমবে।
- যাঁরা অল্প শীতেও কাবু হয়ে পড়েন, তারা ২/৩টি ছোট এলাচ বেটে ও ছেঁকে শরবতের মতো সকালের দিকে খেয়ে নিন। অল্প শীতে আর কাবু হবেন না।
- যাঁরা শ্বাসকষ্টে সারা বছর কষ্ট পান, তাঁরা দুটি ছোট ও দুটি বড় এলাচ একসঙ্গে বেটে এক কাপ জলে মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জলটা নিয়মিত খেলে উপকার পাবেন।
- হাঁপানির কষ্টে গা না ভাসিয়ে ছোট এলাচ ও পিপুল চূর্ণ সমান পরিমাণে নিয়ে একটু গাওয়া ঘি-য়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে অস্বস্তি নিমেষে কমে যাবে।
- অল্প ঠাণ্ডায়, অতি পরিশ্রমে, অমাবস্যা, একাদশী তিথিতে অনেকের

গা-হাত-পা ব্যথা করে। এক্ষেত্রে দুটি বড় এলাচ জল দিয়ে বেটে গরম জলে গুলে, ছেঁকে নিয়ে সকাল বা বিকালে খেলে উপকার পাওয়া যায়। দিনে একবার খেয়ে উপশম না হলে দু'বার খেতে পারেন।
- কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে পেট ব্যথা হলে দুটি বড় এলাচ বেটে গরম জলে মিশিয়ে, ছেঁকে খেলে ব্যথার উপশম হয়। ওই সময় যদি বড় এলাচ বাটা নাভির নিচে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তা হলেও উপকার মেলে।
- কোনও কারণে শরীরের কোন অংশে খিচ ধরলে দুটি ছোট বা বড় এলাচ বেটে গরম জলে গুলে, ছেঁকে খেলে সঙ্গে সঙ্গে উপশম মিলবে। তবে, কয়েকদিন টানা খেলে অসুবিধাটা নির্মূল হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।
- যাঁরা নিত্য বমি রোগে ভোগেন তাঁরা দুটি বড় এলাচ বেটে ঠাণ্ডা জলে ছেঁকে নিয়ে মধু মিশিয়ে খেলে সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন। আর খাদ্যজনিত কারণে বমিভাবে ভুগলে দুটি ছোট ও দুটি বড় এলাচ একসঙ্গে বেটে জলে গুলে ছেঁকে নিয়ে আধ ঘণ্টা অন্তর তিন-চার বার খেলে কষ্ট কমে।
- চুলকানিতেও এলাচের কারিকুরি কম না। বড় এলাচ চন্দনের মতো করে বেটে গায়ে মাখতে হবে। ঘণ্টাখানেক বাদে ধুয়ে ফেলতে পারেন, আবার রেখেও দিতে পারেন। কোনওটাতেই লাভ বই ক্ষতি হবে না।
- বড় এলাচ বেটে গায়ে মাখলে গায়ের দুর্গন্ধ চলে যায়।
- রান্নাবান্নাতেও এর জুড়ির কথা অজানা নয় কারোর। গরম মশলার প্যাকেটে এর উপস্থিতি অপরিহার্য। তাছাড়া পায়েস রান্না করতে গেলেও একে বাদ দেওয়া চলে না। তাই, রান্নাঘরে এর গুণপনা ও ব্যবহারের কথা গৃহবধূরা আরও ভালো বলতে পারবেন। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

**প্রণব**

পড়ুন এ পড়ান

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

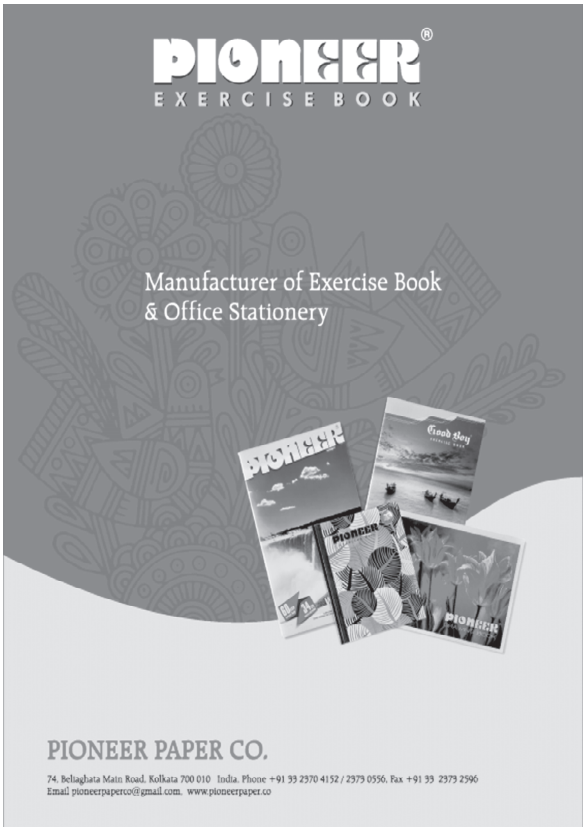

‘বুদ্ধের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা স্বামী বিবেকানন্দের বৌদ্ধিক আবেগগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীবুদ্ধ শুধুমাত্র আর্যগণের ভিতর সর্বাপেক্ষা বরেণ্য ছিলেন তা নয়, কিন্তু জগৎ কদাচিৎ দেখেছে— এমনই একজন সম্পূর্ণ স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কী অসীম স্বাধীন মনোভাব এবং নম্রতা সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের। কী শান্ত, কী পুরুষোচিত ভাব। সত্যিই তিনি ছিলেন পুরুষর্ষভ এবং মানুষের মধ্যে চন্দ্রমাস্বরূপ। যুক্তিতে যেমন সম্পূর্ণ, ভালবাসায়ও তেমনই অতুলনীয়। ’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

**সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী**

## সমাবেশ সমাচার

# ঝাড়গ্রামে শিশু সংস্কার কেন্দ্রে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

গত ২৫ আগস্ট সমাজসেবা ভারতীর উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম শহরে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। ঝাড়গ্রাম লাগোয়া ১৯টি গ্রামে চলা শিশু সংস্কার কেন্দ্রের ভাই-বোন এবং তাদের অভিভাবক ও অভিভাবিকারা অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৮টায় রবীন্দ্রপার্ক থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। এই শোভাযাত্রায় শিশু ভাই বোনেরা কৃষ্ণ সেজে অংশগ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের

ছবিসহ সুসজ্জিত বাহন শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকে। উল্লেখ্য, পাঁচ বছর থেকে বার বছর পর্যন্ত কৃষ্ণ সাজা শিশু ভাই-বোনেরা ৩ কি.মি. পথ অতিক্রম করে গিরি বাড়িতে পৌঁছয়। শিশু ভাই-বোনদের শোভাযাত্রা দেখে উৎসাহিত ঝাড়গ্রামের নাগরিকরা শ্রীকৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। অনেক জায়গায় কৃষ্ণরূপী বালক-বালিকা দেখে সাধারণ লোক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে মঞ্চের কার্যক্রম শুরু হয় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দ্বৈপায়ন গিরি এবং ননীবালা বয়েজ বিদ্যাপীঠের (উঃ মাঃ) প্রধান শিক্ষক অমৃত কুমার নন্দী। বনবাসী ক্ষেত্রের ভাই বোনেরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে দোলযাত্রা পর্যন্ত নাচ-গানের মাধ্যমে তুলে ধরে। কার্যক্রমে বিনপুর নিবাসী দু'জন নরসুন্দর-ভাইকে স্বাবলম্বনের জন্য সেলুনের সামগ্রী প্রদান করা হয়।

# স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আলোচনা সভা

গত ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার কেশব ভবনে স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'জি এম ফুড'। সভায় বিভিন্ন স্থান থেকে বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, কীভাবে জি এম ফুড এবং জি এম ফসল ভারতের জৈবিক কৃষি ও কৃষকদের বিষে জর্জরিত করছে। আলোচনায় উঠে আসে বিদেশি কোম্পানিগুলি কীভাবে ষড়যন্ত্র করে ভারতীয় কৃষকদের নিজস্ব বীজ-ভিত্তিক কৃষিকাজের ওপর কুঠারাঘাত করছে। সভায় ড. দেবল দেব, ড. তুষার চক্রবর্তী, কপিল শাহ এবং কবিতা কুরঙ্গতি বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী। ড. ধনপতরাম আগরওয়াল স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন আর কে ব্যাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুব্রত মণ্ডল। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বদ্রীনারায়ণজী উপস্থিত ছিলেন।

# অরুণাশ্রম সেবা সঙ্ঘের জন্মাষ্টমী

হুগলী জেলার কোলড়া অরুণাশ্রম সেবা সঙ্ঘ এবং বিশ্ব হিন্দুপরিষদের বলাগড় প্রখণ্ডের যৌথ পরিচালনায় অন্যান্য বৎসরের মতো এবারেও অরুণাশ্রম প্রাঙ্গণে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। সকালে নগরসংকীর্তন, গীতা পাঠ-ব্যাখ্যা, কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের পর প্রায় ৬০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এরপর বিশ্বহিন্দুপরিষদের স্থাপনা দিবসের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডুমুরদহ উত্তম আশ্রমের শ্রীমৎ তিতিক্ষানন্দজী মহারাজ। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জেলার প্রচার প্রমুখ অভিজিৎ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানের কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন সুশীল ভট্টাচার্য।

# ছাতনী শিশু মন্দিরে যোগ-কার্যশালা

গত ২১ আগস্ট ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বিদ্যাভারতীর তত্ত্বাবধানে ছাতনী সরস্বতী শিশু মন্দিরে এক দিবসীয় যোগ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তাতে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩২০ জন ছাত্র এবং ২০৩ জন ছাত্রী মোট ৫২৩ জন অংশ গ্রহণ করে। কার্যশালায় উদ্বোধক হিসাবে উখুড়া নরেন্দ্রপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদ মোহন পাল, বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী দেবাশিস শীল ও পারুলিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মলয় ঘোষ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমর কৃষ্ণ ভদ্র উপস্থিত ছিলেন। কার্যশালার সংযোজক দ্বিদল বিহারী দাসের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে ও সুব্রত চক্রবর্তীর পরিচালনায় কার্যশালার সূচনা হয়। উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে বিকাল ৫টায় কার্যশালা সমাপ্ত হয়।

# শোকসংবাদ

কলকাতা গোয়াবাগান শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অমল কুমার সাহা ২৬ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্যামাবাজারের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। আমৃত্যু সংস্কার ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও দুই নাতনী রেখে গেছেন।

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
50g
TURMERIC
POWDER
CUMIN
CORIANDER
RED CHILLI
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

# অলিম্পিক্স সংস্কৃতির জাগরণ দরকার

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য সমাপ্ত অলিম্পিক্সে ভারতের এই পারফরমেন্স দেশ জুড়ে হতাশার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মনে হবে এই ফলাফল মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। গোটা দুনিয়া আজ বুঝে গেছে অলিম্পিক্সের বিশ্বমঞ্চই হল সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষাগার। সর্ববৃহৎ উৎসব তথা যুদ্ধক্ষেত্র। দেশ-কাল- সমাজ-সভ্যতার সঠিক চালচিত্র ফুটে ওঠে এই মহামঞ্চের জয়গানে। ভারতে কী সংসদ, গণমাধ্যম, বেসরকারি শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা এমনকী সর্বসাধারণ পর্যন্ত এই মহাসভ্যতা-সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও তৃণমূলস্তর থেকে অ্যাথলিট বা খেলোয়াড় বেছে তাদের তৈরি করার ক্ষেত্রে কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাই শুধুমাত্র অ্যাথলিটদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা যে সিস্টেম ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে তাতে এই ফল প্রত্যাশিত। তার মধ্যেও দুটি পদক এসেছে। নারীশক্তি ও মুক্তির জয়ধ্বজা উড়িয়ে এসেছে দুই কন্যা। সাক্ষী মালিক চরম প্রতিবন্ধকতা ও অন্ধ কুসংস্কারকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে পদক তুলে এনেছে। এ এক অত্যুজ্জ্বল গরিমামণ্ডিত অসাধারণ কৃতিত্ব আর পি ভি সিন্ধু বেশ কয়েক বছর ধরেই ব্যাডমিন্টনে এক বড় নাম। পরপর দু'বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে ব্রোঞ্জ জিতে অলিম্পিক পদক জয়ের ক্ষেত্রে বড় দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন। দুই বিশ্ব চাম্পিয়ানকে হারিয়ে, ফাইনালে আর এক সুপার চাম্পিয়নের সঙ্গে যে লড়াইটা মেলে ধরেছেন তা দেখে ভারতের বীরাঙ্গনা নারীদের কথা মনে পড়ে যায়। দীপা কর্মকার পদক না পেলেও সারা বিশ্বের মন জয় করে নিয়েছেন। যে খেলাটিতে ভারতের কেনো ঐতিহ্য অবস্থানই ছিল না, সেই খেলাকে একার চেষ্টা ও পারফরমেন্সে জাতে তুলে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে ভারতের জিমনাস্টদের স্বপ্ন ও বাস্তবের মেলবন্ধন করার রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন ভারতীয় অ্যাথলিট এবার কোয়ার্টার ফাইনাল এমনকী সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেছেন। গত লন্ডন অলিম্পিকে ৬ টা পদক ছিল। এবার সেখানে এসেছে দুটি। আপাতদৃষ্টিতে চরম ব্যর্থ মনে হলেও বাস্তবের ছবিটা কিন্তু অন্যকথা বলে। পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এই অলিম্পিকের প্রাপ্তি কিন্তু লন্ডনের কাছাকাছি থাকবে। অন্তত ৭–৮টি ইভেন্টে ভারতীয়রা দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে শেষ চারে কিংবা ফাইনালে গিয়ে হার স্বীকার করেছেন। অ্যাথলেটিক্সে দুজন মহিলা ফাইনাল পর্যন্ত গেছেন। শুটিংয়ে পদক না এলেও অভিষেক বিন্দ্রা ও জিতু রাই চূড়ান্ত পর্বের বাছাইয়ে ছিলেন। তবে শুটিং ছিল সবচেয়ে বড় আশার প্রদীপ। একাধিক পদক অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেখানে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

এছাড়া নাম করতে হয় মার্কিন মহিলা অ্যাথলিট অ্যালিসন ফেলিক্স, বৃটিশ অ্যাথলিট ব্র্যাডলি উইগিন্স, ইথিওপিয়ার দূরপাল্লার মহিলা রানার আলমাজ আয়না, মার্কিন জিমনাস্ট সিমোন বাইলস, চিনের স্ট্রংম্যান ভারোত্তোলক ওয়েন চিয়াং সহ আর্জেন্টিনার হকি টিমের কথা। অতিপ্রাকৃত কীর্তি গৌরবে অলিম্পিক্সের চিরন্তন মহিমাই ফুটে উঠেছে। বাস্কেটবলে যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে স্পেন, অস্ট্রিয়া, আর্জেন্টিনা। ফুটবলে ব্রাজিল তাদের একমাত্র অধরা অলিম্পিক্স সোনাটিও পেয়ে গেল। টেনিসে বেশ কিছু অঘটন ঘটে গেছে প্রথম দিকে। তবে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ তারকা অ্যান্ডি মারে মুখরক্ষা করেছেন বিশ্বটেনিসের। পেন্টাথলান, ট্রায়াথলান সহ স্থল ও জলের সব অ্যাডভেঞ্চার ইভেন্টে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জোরদার লড়াই দেখা গেছে। বক্সিং, কুস্তি, ওয়েট ও পাওয়ার লিফটিং-এর মতো শক্তি প্রদর্শনের খেলাগুলিতে এশিয়ার প্রতিযোগীরা বাকি তিন মহাদেশের সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে উঠেছে। অলিম্পিক্সে ক্রমেই এশিয়া এক বড় শক্তি হয়ে উঠেছে।

এই অলিম্পিক্সে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আন্তর্জাতিক শরণার্থী দলের অংশগ্রহণ। বিশ্বের নানা দেশে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন এসবের ফলে বহু মানুষ ঘরছাড়া---যাযাবরের মতো জীবনযাপন করছেন। বিশ্ব সংস্থা তাদের মধ্যে থেকে যোগ্য ও প্রতিভাবান অ্যাথলিট খুঁজে নিয়ে একটা দল গঠন করে বেশ কিছু ইভেন্টে অংশগ্রহণ করিয়েছে। রাশিয়ার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড ও ভারোত্তোলন দল ডোপিংয়ের দায়ে সাসপেন্ড হয়ে অলিম্পিক্সে অংশ নিতে পারেনি এটা যেমন অলিম্পিক্স স্পিরিটকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, পাশাপাশি শরণার্থীদের অংশগ্রহণে সেই স্পিরিট এবং চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তো বিশ্বের একনম্বর ধনকুবের তথা বহুবিধ জনকল্যাণমুখী কাজের জন্য ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা বিল গেটস বলেছেন, অলিম্পিক্স শুধুমাত্র বিশ্বসংসারের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ উৎসবই নয়, এ হলো সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে অনন্তকাল চেতনার যোগসূত্র। ।

শব্দরূপ– ৮০৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

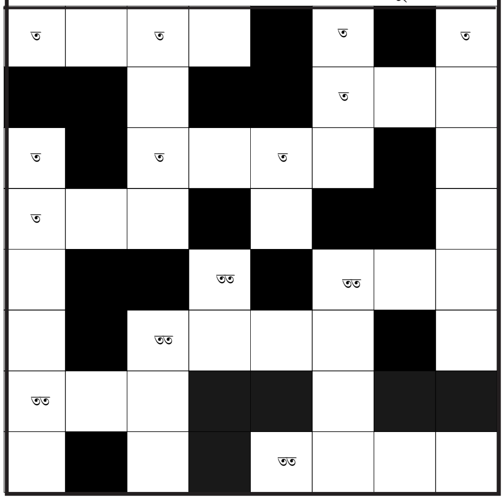

সূত্র ঃ

**পাশাপাশি ঃ** ১। উমার পিত্রালয়ে আগমন বিষয়ক গীতি ৫। বাহ্য আড়ম্বর ৭। আটা গুড় ইত্যাদির পিষ্টক বিশেষ ৯। মাংস মাছ ইত্যাদির ব্যঞ্জন ১১। গলা সরু জলপাত্র, প্রথম দুয়ে মদ্য ১২। যে অনর্থক নানা দেশে ঘুরে বেড়ায় ১৩। জোরে পতন বা হৃস্পন্দনের শব্দ ১৪। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি — '

**উপর-নীচ ঃ** ২। অবিদ্যা, প্রকৃতি; ভগবতী ৩। নির্ভীকতার অন্য নাম দুর্গা ৪। বাহন-এর পরিচয়ে দেবী দুর্গা ৬। রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময়, শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল বলে এই নাম ৮। আফিম ফলের বীজ ২০। '— আনন্দে জাগো' ১১। গঙ্গা; ভগবতী ১২। জলবৎ, পানসে।

সমাধান : শব্দরূপ– ৮০১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পা | ঞ্চ | জ | ন্য | | মৌ | | বি |
| | | ল | | | তা | লা | শ |
| ক | | পা | রা | ব | ত | | ল্য |
| ম | উ | নি | | টু | | | ক |
| লে | | | স | | বি | ব | র |
| কা | | শা | ন্ত | ন | ব | | ণী |
| মি | না | র | | | স | | |
| নী | | দ | | ধা | ন | সিঁ | ড়ি |

**সঠিক উত্তরদাতা : সুনীল বিষ্ণু, সিউড়ী, বীরভূম**
**সুশীল কুমার, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

▯ ৮০৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়।

# প্রেরণার পাথেয়

অন্য লোকের সঙ্গে আমাদের এই পার্থক্য যে তারা শরীরকে সাধ্য মানে, আর আমরা সাধন মনে করি। এই প্রেক্ষিতে আমরা শরীরকে বিচার করি। যা কিছু বাহ্যিক প্রয়োজন তা পূর্তি করা আবশ্যিক একথা আমরা স্বীকার করি কিন্তু সর্বৈব নয়। মানুষের শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার আবশ্যকতাগুলির পূর্তি, তার বিভিন্ন কামনা, ইচ্ছা ও জিজ্ঞাসাগুলির সমাধান এবং তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দৃষ্টিতে কর্তব্যকেই এখানে চারপ্রকার পুরুষার্থের মধ্যে কল্পনা করা হয়। চারটি পুরুষার্থ হল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। পুরুষার্থের অর্থ সেই কাজ থেকে আসে যেখানে পুরুষত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এসবের কামনা মানুষের স্বাভাবিকভাবে আসে এবং তা পালন করে আনন্দ পায়। এই পুরুষার্থগুলিরও আমরা বিশেষভাবে চিন্তা করি। যদিও মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ মনে করা হয় তবুও এককভাবে তা পালন করলে মানুষের কল্যাণ হতে পারে না। বাস্তবে যে অন্য পুরুষার্থগুলির অবহেলা করে সে মোক্ষ প্রাপ্তির অধিকারী হতেই পারে না। অপরপক্ষে অবশিষ্ট পুরুষার্থগুলির লোকসংগ্রহী বিচারে, নিষ্কাম ভাবে কাজ করা ব্যক্তি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষ প্রাপ্ত হতে পারে।

* * *

সম্পদ অথবা অন্য যা কিছু অধিকারে রয়েছে তা শাশ্বত নয়। সেসব সমাজহিত সাপেক্ষ। বাস্তবে এ সবের অধিকার কোনও ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যাতে সে তার দ্বারা সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পারে। সৈনিককে অস্ত্র দেওয়া হয় যাতে তার দ্বারা সমাজকে রক্ষা করতে পারে। যদি সে তার দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে তার অস্ত্রধারণ করার কোনো অধিকার থাকবে না। এরকম, ব্যক্তি সম্পদের অধিকার এজন্য পায় যাতে সে সামাজিক দায়িত্ব পালনে করে। এই কাজের জন্য সময়ে এই অধিকার—বোধের ব্যাখ্যা ও মর্যাদার পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। সম্পদের অধিকার সমাজনিরপেক্ষ কোনো বিষয় নয়।

***(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)***

# ।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ৭

# স্বস্তিকা

## পূজা সংখ্যা : ১৪২৩

**মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে**

*পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো*

### উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - **সমুদ্ভাবিত অনুত্তম**
সুমিত্রা ঘোষ - **শিরিণ**
জিষ্ণু বসু - **আমি মাধবী চট্টোপাধ্যায় বলছি**

### গল্প

রমানাথ রায় - **ভালোবাসার রকমফের**
শেখর বসু - **অন্তরালে**
এষা দে - **একতলার বাসিন্দা**
প্রবাল চক্রবর্তী - **দানবোখা ভবিষ্যতি**
গোপাল চক্রবর্তী - **দেশান্তর**

### রম্যরচনা

সুন্দর মৌলিক - **চীনের চাউমিন আমাদের চাউমিন**

### ভ্রমণ কথা

কুণাল চট্টোপাধ্যায় — **চীন থেকে ফিরে**

### চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — **স্বামীজীর চারতীর্থে কুমারী পুজো**

### ইতিহাস

সৌমেন নিয়োগী - **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য— তালকাড**

### খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় - **বিশ্বশ্রীর মন্দিরে বেহাল দশা**

### প্রবন্ধ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস - **মীরা পঞ্চশতী**
ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী - **শকাব্দ : ভারতের নিজস্ব জাতীয় কালপঞ্জী**
ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় - **ভগিনী নিবেদিতা ও সরলাদেবী চৌধুরানি**
ড. তুষারকন্তি ঘোষ - **উত্তরবঙ্গের ভারতভুক্তি আন্দোলনের এক বিস্ময়কর কাহিনি**
দেবীপ্রসাদ রায় - **আইনস্টাইনের ঈশ্বর ও ধর্মভাবনা এবং বেদান্ত**
অমলেশ মিশ্র - **বিশ্বের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর**
রবিরঞ্জন সেন - **মহারাষ্ট্রের ভক্ত-কবি পরম্পরা ও মারাঠা জাতীয় জাগরণ**
রজত পাল - **ঋকবেদ ও জেন্দ আবেস্তা**
অরিন্দম মুখোপাধ্যায় - **ছিন্ন তমসুকের কাহিনি**
অর্ণব নাগ - **রঘু ডাকাত : রূপকথায় ও বাস্তবে**

### বিনোদন

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় - **অবিস্মরণীয় কমেডিয়ানরা**

### নবাঙ্কুর (ছোটদের বিভাগ)

সিদ্ধার্থ সিংহ - **অমরত্ব**
বিরাজ নারায়ণ রায় - **মহাদেবের ষাঁড়**
শান্তনু গুড়িয়া - **শব্দরূপ**

**সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা**

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
12 September - 2016 - Rs. 10.00,

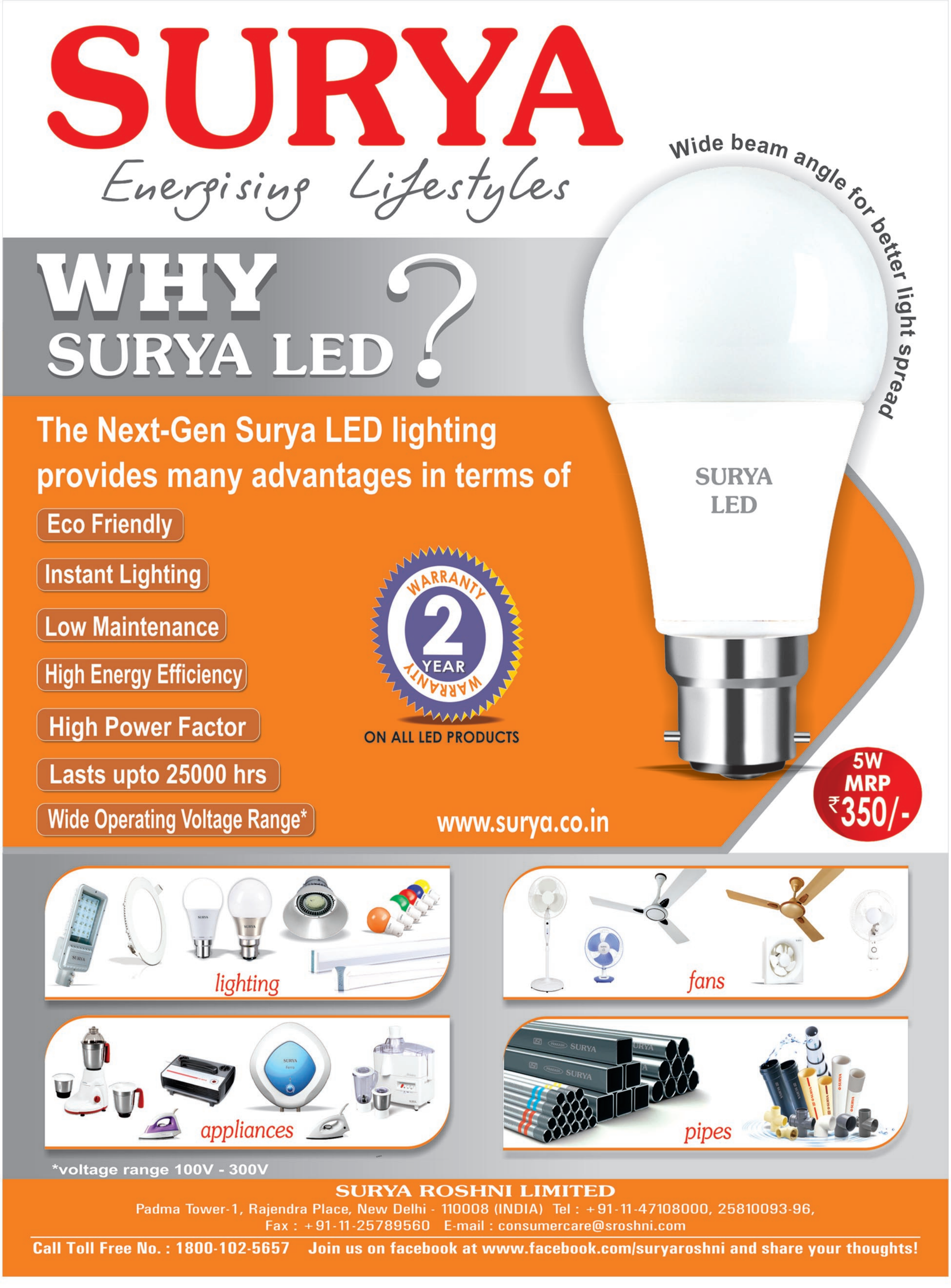


Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।